অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১২

নাগরিক উদ্যোগ

সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

স্থিতিশীল সীমান্তের প্রত্যাশা

ছিটমহলবাসীর ছয় দশকের বঞ্চনা

বাংলাদেশ যখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় কারাগার

২০১২ সালের মানবাধিকার পরিস্থিতি

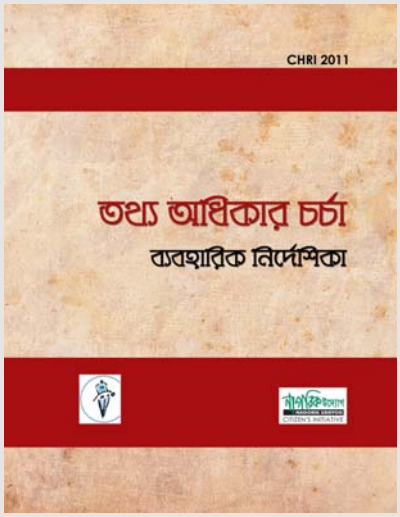

তথ্য অধিকার চর্চা : ব্যবহারিক নির্দেশিকা

এ বইটিতে তথ্য অধিকার আইনের প্রধান ধারাসমূহ, তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার, তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা, তথ্য কমিশনসহ তথ্য অধিকার আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে কী ধরনের তথ্য পাওয়া যাবে, কী কী তথ্য সরকার দিতে বাধ্য নয় এবং তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের ইতিবাচক উদাহরণসহ বিভিন্ন বিষয় কেইসস্টাডির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে যা সকল স্তরের জনগণকে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করবে। বইটির উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির মৌলিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ তথ্যের জন্য অনুরোধ, আপিল ও অভিযোগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে নমুনাসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। আশা করছি, এ পুস্তকটি তথ্য প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ সকল নাগরিকের তথ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্যে করবে।

গ্রন্থনা, বিশ্লেষণ ও সম্পাদনা : মাজহারুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম ও অমিত রঞ্জন দে

প্রকাশক : নাগরিক উদ্যোগ ও কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ

প্রকাশকাল : ২০১১

মূল্য : ২০০ টাকা

ISBN : 978-984-33-3305-6

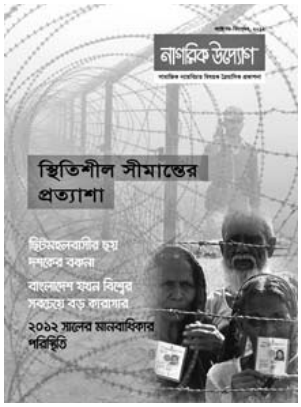

নাগরিক উদ্যোগ
সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১২

সম্পাদক
জাকির হোসেন

সহযোগী সম্পাদক
হোজ্জাতুল ইসলাম

সম্পাদনা পরিষদ
আলতাফ পারভেজ
মাজহারুল ইসলাম
মাহাবুবা সুলতানা
সোমা দত্ত

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মিঠু আহমেদ

প্রচ্ছদের ছবি
ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

আলোকচিত্র
নাগরিক উদ্যোগ ও ইন্টারনেট

প্রকাশক
সম্পাদক কর্তৃক ৮/১৪, ব- ক-বি
লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭ থেকে
প্রকাশিত।
ফোন : ৮১১৫৮৬৮
ফ্যাক্স : ৯১৪১৫১১
ই-মেইল : nuddyog@gmail.com

মুদ্রণ
প্রকাশক কর্তৃক নূর কার্ড বোর্ড বক্স
ফ্যাক্টরী, ১৯/১, নীলক্ষেত বাবুপুরা
ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

দাম : ২০ টাকা।

ছিটমহলে বসবাস : ছয় দশকের রাষ্ট্রীয় বঞ্চনা ও মানবেতর জীবনযাপন / ৩

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ছিটমহলগুলোতে রাষ্ট্র কি শুধুই ভূমি রক্ষার প্রহরী, নাকি বসবাসকারী নাগরিকদের মৌলিক অধিকার পূরণের দায়িত্ব পালনকারী অভিভাবকও বটে? ছিটমহলে বসবাসকারী উপেক্ষিত জনগোষ্ঠীর ছয় দশকের বঞ্চনার খোঁজখবর নিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন শিক্ষক ও গবেষক ড. মো. মিজানুর রহমান।

বাংলাদেশ যখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় কারাগার / ৮

ভারত বাংলাদেশের চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের প্রকল্প বেশ জোরেসোরেই বাস্তবায়ন করছে। অচিরেই হয়তো বিশ্বের সবচেয়ে বড় কারাগারে পরিণত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ! অথচ এ নিয়ে যেন কারো কোনো মাথা ব্যাথা নেই। নেই কোনো জোরালো প্রতিবাদও। সময়ের অনুচ্চারিত এই উদ্বিগ্নতা নিয়ে লিখেছেন গবেষক ও লেখক আলতাফ পারভেজ।

মানবাধিকার পরিস্থিতি ২০১২ / ১৯

মানবাধিকারের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো বেঁচে থাকার অধিকার, আর সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র সে অধিকার নিশ্চিত করবে। কিন্তু দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে আমরা এর উল্টো চিত্রই দেখতে পাই। কখনো কখনো রাষ্ট্র নিজেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। দেশের ২০১২ সালের মানবাধিকার পরিস্থিতির বিস্তারিত জানাচ্ছেন গবেষক ও মানবাধিকারকর্মী মাজহারুল ইসলাম।

আরো যা আছে

সমকালীন প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গা ইস্যু ১০
নূরণ্টএণ্টজ্জামান্তুল ফেরদৌস রুহী

থামবে কবে সীমান্ড়ে হত্যা? ১২
ইন্দিরা হক

সীমান্ড় হাট ও সীমান্তের মানুষের অর্থনীতি ১৩
হোজ্জাতুল ইসলাম

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার অভিন্ন পরিবেশগত সমস্যাসমূহ ১৫

মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে চামড়া শিল্পের শ্রমিকরা ২৫
হিউম্যান রাইটস ওয়াচণ্টএর প্রতিবেদন

বাংলাদেশে দলিত বিপন্নতা : সামাজিক ন্যায়বিচার ও আইনের স্বরূপ সন্ধান ২৬
এস.এম. মাসুম বিলণ্টাহ

অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ : একজন সফল শিক্ষক-সংগঠকের চিরবিদায় ৩২
জাকির হোসেন

স ম্পা দ কী য়

সম্পাদকীয়

স্থিতিশীল সীমান্তের প্রত্যাশা

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রতিবেশী দেশ ভারতের সহযোগিতার সূত্র ধরে গড়ে ওঠা এই দুই দেশের বন্ধুত্বকে শুধু পুরনো বললে এক অর্থে অনেক কমিয়ে বলা হয়। ভারত ও বাংলাদেশের এই সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবেই অনেক গুরুত্ব বহন করে। প্রতিবেশী হওয়ার কারণে দুই দেশের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কে অনেক সমস্যাও বিদ্যমান। এই সমস্যার একটা হলো সীমান্ত বিরোধ। দুই দেশের নীতিনির্ধারকদের আশ্বাসের ফুলঝুরিতে ঝুলে আছে বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তের স্থিতিশীলতা। কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়ায় সীমান্তে হত্যাকান্তের ঘটনা থামানো যাচ্ছে না। এর সাথে রয়েছে দুই দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিটমহলের কয়েক হাজার মানুষের মানবেতর জীবনযাপন। অভিন্ন নদীগুলোর পানিবণ্টন নিয়েও রয়েছে কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব। এ ধরনের কিছু যৌথ বিষয়ের গ্রহণযোগ্য সমাধান দাঁড় করানো জরুরি হয়ে পড়েছে। এ জন্য উভয় দেশের মধ্যে আলোচনার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের অন্যতম আলোচিত বিষয় হলো সীমান্তের হত্যাকাণ্ড। বলপ্রয়োগ আর গুলি চালিয়ে বাংলাদেশী বেসামরিক নাগরিকদের হত্যার অনেক অভিযোগ রয়েছে বিএসএফের বিরুদ্ধে। সীমান্তের কাঁটাতারে ফেলানির বীভৎস লাশ আমাদের মনে দাগ কেটে দিয়েছে। হাবিবকে বিবস্ত্র করে নির্যাতনের ঘটনাও বেশ আলোচিত। ভারতের পক্ষ থেকে সীমান্তে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের যে যুক্তি দেখানো হয়, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, চোরাচালান এমন কোনো অপরাধ নয়- যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হতে পারে, আর বিএসএফও কোনো আদালত নয়। তাদের বিচার করার ক্ষমতা নেই। বিএসএফ কাউকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করতে পারে, কিন্তু তাদের গুলি চালানো অবৈধ এবং তা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী অপরাধ। এসব ঘটনায় হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো বিএসএফকে 'ট্রিগার হ্যাপি' ফোর্স বা 'বন্দুকবাজ' বাহিনী বলে আখ্যা দিয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু তারপরও সীমান্তে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা কমছে না।

অনেক দিনের আরেকটি সমস্যা হলো বাংলাদেশ ও ভারতের ছিটমহল। ছিটমহল বিনিময়ের সিদ্ধান্ত হওয়ার পরও তা বাস্তবায়ন না হওয়ায় ছিটমহলবাসীর হতাশা ও দুঃখ-দুর্দশা লাঘব হচ্ছে না। স্থল সীমান্ত প্রটোকল দুই দেশে এখনো অনুমোদন না হওয়ায় তা বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। কবে নাগাদ এটি সম্পন্ন হবে, সে বিষয়েও কোনো সুস্পষ্ট সময়সীমা নেই।

কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অবশ্য দুই দেশের সীমান্তে কিছুটা অগ্রগতি হলেও তা আশাব্যঞ্জক নয়। ২০১০ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর এবং পরবর্তীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরে বেশ কিছু বিষয় উঠে আসে। এখন সময় এসেছে তাদের মধ্যকার আলোচনা উপসংহারে পৌঁছা এবং সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়ন করা। সম্প্রতি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশে আসার পর ভিসাপ্রাপ্তি সহজীকরণ সংক্রান্ড় একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অনেক দিন ধরে ঝুলে থাকার পর স্বাক্ষরিত হয়েছে বন্দিবিনিময় চুক্তিও। দুই দেশের সীমান্ড়ে এখন হাট বসছে। ফলে সীমান্তবর্তী স্থানীয় মানুষের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগ সম্প্রীতির লক্ষণ। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সহনশীলতা বাড়লে এই সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য আরো বাড়বে। বাংলাদেশের মানুষ সবসময়ই প্রত্যাশা করে, দু'দেশের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সম্পর্ক অটুট থাকুক এবং সাংস্কৃতিক বন্ধন আরো শক্তিশালী হোক। একইসাথে স্থিতিশীল ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকুক দুই দেশের সীমান্ত।

ছিটমহলে বসবাস : ছয় দশকের রাষ্ট্রীয় বঞ্চনা ও মানবেতর জীবনযাপন

ড. মো. মিজানুর রহমান

বিশ্ব মানচিত্রের অসঙ্গতিগুলোর দিকে কেউ যদি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে তাকায় তাহলে তার চোখ থমকে দাঁড়াবে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ড় রেখায় (বৃহত্তর বাংলায়)। এটি এমনই এক ভৌগোলিক অবস্থান যেখানে সুসজ্জিত উদ্ভট সীমারেখা দিয়ে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা পশ্চিমবঙ্গ থেকে। স্মরণাতীত কাল থেকে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের একটি অঞ্চল '৪৭ এর দেশভাগের পটভূমিতে বিতর্কিতভাবে বিভক্ত করা হয়। যার ফলে বিগত ৬৩ বছর ধরে ছিটমহল ও সীমানারেখা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য গোলকধাঁধা, বিয়োগান্ড়ক উপাখ্যান। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ পাকিস্ড়ান থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশের অন্যতম বন্ধুপ্রতীম প্রতিবেশী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তথাপি উভয় রাষ্ট্রকেই প্রতিনিয়ত মোকাবেলা করতে হচ্ছে ছিটমহল ও সীমান্ড় সংক্রান্ড় এক অন্ড়হীন সমস্যা।

'৭১ পরবর্তী বিগত ৪২ বছরে উভয় দেশ অগণিত চুক্তি, সমঝোতা বৈঠক বা সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করলেও সমস্যাগুলোর নিরসন হয়নি এবং সময়ে সময়ে তা প্রকট হয়ে উভয় রাষ্ট্রের কূটনৈতিক ও পররাষ্ট্রনীতির প্রক্রিয়াকে পর্যবসিত করেছে অচলায়তনে। সমস্যার ব্যাপ্তি যেমন প্রসারিত হয়েছে অন্যদিকে সমস্যার ধরনে জটিলতা হয়েছে পুঞ্জীভূত। ফলে বাংলাদেশ-ভারত উভয় রাষ্ট্রের জন্য ছিটমহল ও সীমান্ড় সমস্যা বিশ্বায়নের এই দিনে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। উভয় দেশের ছিটমহলের অধিবাসীরা আজও নিজভূমে পরবাসী। নাগরিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারের চরম অবহেলা ও উপেক্ষাই যেন তাদের স্বাভাবিক নিয়তি। রাষ্ট্র প্রদত্ত সাংবিধানিক অধিকারসমূহ এখানে অকার্যকর। আন্ড়র্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন এখানে নিত্য-নৈমিত্তিক। উভয় দেশের ছিটমহল গুলো আজ বঞ্চনার আকর ভূমি। অন্যদিকে ভারত নির্মিত ২.৫ মিটার উঁচু ও ৪ হাজার ১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ কাঁটাতারের বেড়া বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ড়ে যেন এক মূর্তিমান আতঙ্ক। এই কাঁটাতারের বেড়াকে বিশ্বের দীর্ঘতম রক্তঝরানো ও মরণঘাতী সীমান্ড় বেড়া বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে যা বছরের পর বছর ধরে রক্তের ছোপে রঞ্জিত হয়ে চলছে যা আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় এসব বিরোধ অনাকাঙ্ক্ষিত। উভয় দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের প্রশ্ন, 'সমাধান আর কতদূর? সীমান্ড়ে আর কত রক্তপাত? ছিটমহল সমস্যা নিয়ে আর কত তামাশা?

সঙ্গতই প্রশ্ন উঠেছে, ছিটমহলগুলোতে রাষ্ট্র কি শুধুই ভূমিপ্রভু বা ভূমি রক্ষার অতন্ত্র প্রহরী, নাকি বসবাসকারী নাগরিকদের দায়িত্ব পালনকারী অভিভাবকও বটে?

সীমান্ড়ে নিগৃহীত মানুষ ও ছিটমহলে বসবাসকারী উপেক্ষিত ভূমিপুত্রদের নিয়ে কি একের পর এক মঞ্চস্থ হতেই থাকবে শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডি নাটক বা রচিত হতে থাকবে 'পতিত ভূমি' (Waste land) এর মতো মহাকাব্যিক কবিতা? রক্তে রাঙানো ফেলানী উপাখ্যানের শেষ কোথায়? দু'টি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বন্ধুপ্রতীম সম্পর্ককে অটুট এবং অর্থবহ করতে হলে এসব সমস্যার আশু সমাধান সময়ের দাবি মাত্র।

বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল :

ছিটমহল (Enclave) শব্দের আভিধানিক অর্থ দ্বীপায়নিক রাজ্য। রাষ্ট্রের মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ভূ-ভাগ যা অন্য রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অন্ড়র্ভুক্ত (Holding lying detached from the parent land)। বাংলাদেশ ও ভারতের অভ্যন্ড়রে অবস্থিত ছিটমহলগুলো এক দেশের সীমানার সম্পূর্ণ ভিতরে বিচ্ছিন্নভাবে থেকে যাওয়া অন্যদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুচ্ছ ভূখন্ড (Small pieces of clustered land)। আবার এমনও আছে বাংলাদেশের ভেতরে ভারত, তার ভেতরে আবার বাংলাদেশ। যেমন বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা কুড়িগ্রামে ভারতের ছিটমহল দাশিয়ার ছড়া। দাশিয়ার ছড়ার ভিতরে রয়েছে বাংলাদেশের একটি ছিটমহল চন্দ্রখানা। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, বাংলাদেশের ভূখন্ডে ভারতের ১১১টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখন্ড বা ছিটমহল রয়েছে যার সর্বমোট আয়তন ৭০ বর্গকিলোমিটার (মোট জমির পরিমাণ ১৭ হাজার ১৫৮ একর)। অন্যদিকে ভারতের ভূখন্ডে বাংলাদেশের রয়েছে ২৮ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট ৫১টি ছিটমহল (মোট জমির পরিমাণ ৭ হাজার ১১০ একর)। ভারতের মালিকানাধীন ছিটমহলগুলো বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের লালমনিরহাটে ৫৯টি, পঞ্চগড়ে ৩৬টি, কুড়িগ্রামে ১২টি ও নীলফামারী জেলায় ৪টি

অবস্থিত। বাংলাদেশের মালিকানাধীন ছিটমহলগুলো ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোচবিহার জেলায় ৪৭টি এবং অন্য ৪টি জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত। উপমহাদেশের মুগল সাম্রাজ্যের কাল থেকে ছিটমহলগুলোর আবির্ভাব ঘটে রাজন্যবর্গের রাজ্যবিস্তার, আধিপত্যবাদ ও কতিপয় সন্ধির ফলাফল হিসেবে। '৪৭ এর দেশভাগের সময় থেকে ছিটমহলগুলোর মালিকানা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং ১৯৫২ সালে এটি চরম সংকট আকারে দেখা দেয় যখন উভয় রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে যাতায়াতের জন্য পাসপোর্ট প্রথা চালু করা হয়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :

মুগল আমল

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে বাবর ভারতে মুগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন যা পরবর্তী দু'শ বছর ধরে ভারতের ইতিহাসের গতিপথ রচনা করে। মুগলরা ভারত বিজয়ের পর সমগ্র ভারতে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিযান অব্যাহত রাখে। এর অংশ হিসেবে তদানীন্তন ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় কোচবিহার রাজ্যে দফায় দফায় আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোচবিহার রাজ্য মুগল আক্রমণের শিকার হয়। একপর্যায়ে কোচবিহার রাজ্য মুগলরাজের সাথে সন্ধি স্থাপন করে। কোচবিহার মুগলদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। মুগল অধিকৃত এলাকায় কোচরাজ্যের কিছু অনুগত লোক ছিল যাদের 'রাজগীর' বলা হতো। অপরদিকে কোচ রাজ্যভুক্ত এলাকাতেও মুগলদের অনুগত লোক ছিল যারা 'মোগলাম' নামে পরিচিত। উভয়েই সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নিকট থেকে জায়গীর বা ভূমিস্বত্ব ভোগ করছিল। সন্ধি পরবর্তী সময়ে এই দুই শক্তির অনুগতদের সম্পত্তি চিহ্নিতকরণের ফলে ছিটমহলের সৃষ্টি হয়। এসব ছিটমহল তখনকার দিনে তিনটি পরগনাঃ কইকানা, পাটগ্রাম ও পাটগ্রামের উত্তরভাগঃএর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। সন্ধির শর্ত মোতাবেক কোচবিহার রাজ্যের অনুগত রাজগীর ভূঃ সম্পত্তিগুলো (মুগল রাজ্যের ভিতরে) কোচ রাজ্যের মালিকানাধীন বলে গণ্য হয়। অপরদিকে কোচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরে মুগল অনুগত মোগলাম ভূঃসম্পত্তিগুলো মুগল রাজ্যের অধিভুক্ত হয় (বৃহত্তম রংপুর জেলাধীন)। উভয়পক্ষের দায়বদ্ধতার ফলে মুগলঃকোচ পারস্পারিক সম্পর্ক ও স্বার্থরক্ষার খাতিরে ছিটমহলগুলোকে ব্যবহার করা হয় 'দাবার ঘুটি' হিসেবে।

ইংরেজ আমল :

ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বেশ কিছু করদরাজ্য ব্রিটিশ রাজের বশ্যতা স্বীকার করে পূর্বের মতো বৈশিষ্ট্য নিয়ে টিকে থাকে। ঐসব রাজ্য সুনির্দিষ্ট কর প্রদানের শর্তে ব্রিটিশ রাজের নিকট থেকে স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা ভোগ করে। কোচবিহার তেমনই একটি রাজ্য। ফলে ব্রিটিশ রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যেও করদরাজ্য কোচবিহার এবং ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন পূর্ব বাংলার বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে পূর্বের মতোই ছিটমহলগুলো অবস্থান করে। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে সামন্ত প্রভুদের সম্মতিপূর্বক ঐ রাজ্যগুলো নবগঠিত দু'টি রাষ্ট্রের যেকোনোটিতে যোগ দেয়ার বিধান রাখা হয়। পরবর্তীতে এসব রাজ্য নিয়ে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং যুদ্ধে রূপ নেয়। পাঞ্জাব, জুনাগড় ও কাশ্মীরের ঘটনা এক্ষেত্রে উলেঃখযোগ্য।

স্বাধীন ভারত :

১৯৪৭ সালে দীর্ঘ ১৯০ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু এই স্বাধীনতা অর্জনের সূচনালগ্নে ভ্রান্ত দ্বিঃজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান– দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। এই দ্বিঃজাতি তত্ত্ব হচ্ছে ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে ইংরেজ কর্তৃক অনুপ্রবিষ্ট সাম্প্রদায়িক দর্শনের মূর্ত প্রকাশ। যদিও প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন জাতিসত্তার নান্দনিক বৈচিত্র্য, দ্বন্দ্বঃসমন্বয়ে ভারতবর্ষে ছিল নানা ধর্মঃবর্ণঃসংস্কৃতির মানুষের সহাবস্থান।

স্বাধীনতা লাভের পর দেশ বিভক্তি নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। সংঘঠিত হতে থাকে একের পর এক দাঙ্গা। ১৯৪৭ সালে ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলঃভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে দেশীয় (করদরাজ্য) রাজ্যগুলোর জন্য একটি বিশেষ মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। '৪৯ সালের মধ্যে ৬০১টি দেশীয় রাজ্যের মধ্যে ৫৫৫টি ভারতভুক্ত হয় এবং ৪৬টি রাজ্য পাকিস্তানে যোগ দেয়। ১৯৪৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর গভর্নর জেনারেল অব ইন্ডিয়ার সাথে কোচবিহার মহারাজা জগদ্বীপেন্দ্র নারায়ণের চুক্তির ফলে কোচবিহার রাজ্যটিও ভারতের সাথে অঙ্গীভূত হয়। ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি কোচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু এই স্বাধীনতা অর্জনের সূচনালগ্নে ভ্রান্ত দ্বিঃজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান– দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। এই দ্বিঃজাতি তত্ত্ব হচ্ছে ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে ইংরেজ কর্তৃক অনুপ্রবিষ্ট সাম্প্রদায়িক দর্শনের মূর্ত প্রকাশ।

ভৌগোলিক বিভাজন :

দেশ বিভাগের পর লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা মাফিক ৩ জুন ১৯৪৭ বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ভাগ করার জন্য দেশ বিভাগ সীমানা কমিশনের সভাপতি হিসেবে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লীফকে দায়িত্ব দেয়া হয়। স্বাধীনতা ঘোষণার সন্নিকটে উত্তেজনাকর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে র‍্যাডক্লীফের উপর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ দু'টি প্রধান দলেরই চাপ ছিল। ফলে এ রকম এক জটিল কাজ তাঁকে সম্পন্ন করতে হয়েছিল দ্রুততার সাথে, মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে। স্যার র‍্যাডক্লীফ ৮ জুলাই লন্ডন থেকে দিলঃী পৌছেন এবং ১৩ আগস্ট অর্থাৎ স্বাধীনতার দু'দিন আগে তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন।

দীর্ঘকালের একীভূত যোগাযোগ ব্যবস্থা, সমন্বিত অর্থনীতি ও স্থিতিসম্পন্ন অখণ্ড এলাকার মাঝ বরাবর সানন্দে দাগ টেনে দেয়া হয়। দুই নতুন সার্বভৌম দেশের সীমারেখার এপারে ওপারে ব্রিটিশ ভারতের পূর্বঃপশ্চিম অঞ্চলের দুটি প্রদেশঃ বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ হয় এক উদ্ভট সীমানা রেখা টেনে। ১৬ আগস্ট সীমারেখা নির্ধারণী টপসীটের মূলকপি জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়। এই রায় যে বিতর্কের বিষয় হবে তা কমিশনের কাছেও নিশ্চিত ছিল। এতে অবিচার ও দুর্ভোগকে এড়ানো যায়নি। ফলে

দাঙ্গা, খুন, সম্পদহানি, লুণ্ঠনে ও রক্তের বন্যায়ণ্ঢ এ দুঁটি প্রদেশ বীভৎস প্রেতপুরীতে পরিণত হয়েছিল। মানচিত্রে অসঙ্গতির কারণে র‍্যাডক্লীফ যেভাবে দাগিয়েছেন বাস্ড়বে সীমানা সেভাবে নির্ধারিত হওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে সীমারেখার এপারেণ্ঢ ওপারে খাপছাড়াভাবে অবস্থান করে উভয় দেশের ছিটমহলগুলো।

ছিটমহল বিনিময় চুক্তি (ভারত-পাকিস্তান পর্ব) :

দেশ বিভাগের পর ছিটমহল ইস্যু ভারত ও পাকিস্ড়ানের দ্বিণ্ঢপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তেজনা বাড়াতে থাকে। অবস্থা সামাল দিতে ১৯৫৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ও পাকিস্ড়ানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নূনের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে নিজ নিজ দেশের ভূখন্ডে অবস্থিত ছিটমহলগুলো বিনিময়ে উভয় পক্ষ সম্মত হয় এবং এ লক্ষ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মতামত চাওয়া হয় ভারতের সুপ্রীম কোর্টের। ছিটমহল বিনিময় সংক্রান্ড় এটিই প্রথম চুক্তি যা 'নেহেরুণ্ঢনূন চুক্তি' নামে খ্যাত। কিন্তু ভারত ও পাকিস্ড়ানের ক্রমবর্ধমান টানাপোড়েন সম্পর্ক এবং ভারতীয় আদালতে এই চুক্তি কার্যকরের বিরোধিতা করে একাধিক মোকদ্দমা রুজুর প্রেক্ষাপটে ছিটমহল ইস্যু থমকে দাঁড়ায়।

ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি (বাংলাদেশ পর্ব) :

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সীমানা ও ছিটমহল সংক্রান্ড় সমস্যা নিরসনে আশার সঞ্চার করে। ১৯৭৪ সালের ১৬ মে নয়াদিলণ্ঢীতে স্থলসীমানা নির্ধারণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়ে সম্পাদিত হয় ঐতিহাসিক ইন্দিরাণ্ঢ মুজিব সমঝোতা চুক্তি। তখন দু'দেশের মধ্যে সীমানা চিহ্নিতকরণের কাজও শুরু হয়েছিল। চুক্তির ১৪ ধারা অনুসারে, বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার সীমান্ড়ের ওপারে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত বাংলাদেশের ছিটমহল আঙ্গরপোতাণ্ঢ দহগ্রামকে বাংলাদেশের মূল ভূখন্ডের সাথে যুক্ত করতে তিন বিঘা আয়তন বিশিষ্ট স্থায়ী সংযোগ ভূমির ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এই সংযোগ ভূমি 'তিনবিঘা করিডোর' নামে খ্যাত। উলেণ্ঢখ্য, আঙ্গরপোতাণ্ঢদহগ্রাম ছিটমহলটি বাংলাদেশের মালিকানার সর্ববৃহৎ ছিটমহল এবং বাংলাদেশের সীমান্ড়ঘেঁষা। এর আয়তন ২৫.৩৫ বর্গকিলোমিটার, লোকসংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। চুক্তি অনুযায়ী

> অবশেষে ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ ও ভারত উভয় রাষ্ট্র ঘোষণা দেয় যে, উভয় দেশের নিজ নিজ ভূখন্ডের ১৬২টি ছিটমহল পরস্পর বিনিময়ের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে হবে।... ছিটমহলবাসীদের মধ্যে দেখা যায় আনন্দের বন্যা। অথচ এর পর এক বছরেরও অধিক সময় অতিক্রান্ড় হলেও এ বিষয়ে অগ্রগতি থমকে দাঁড়ায়।

ভারত বাংলাদেশকে তিন বিঘা করিডোর ৯৯৯ বছরের জন্য লিজ দিবে। বিনিময়ে জলপাইগুড়ি সীমান্ড়ে অবস্থিত বেরুবাড়ী ইউনিয়নের দক্ষিণ বেরুবাড়ীর সংশিণ্ঢষ্ট অংশ ভারতকে ছেড়ে দিতে হবে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ইন্দিরাণ্ঢমুজিব চুক্তিটি অনুমোদন করে। কিন্তু ভারতীয় পক্ষ সাংবিধানিক ও আইনগত বিতর্কের কারণে করিডোর হস্ড়ান্ড়র প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত করে। ঐ বিতর্ক ৭ অক্টোবর ১৯৮২ সালে আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া পর্যন্ড় অব্যাহত ছিল। ১৯৮২ সালের নতুন চুক্তিতে ভারত বাংলাদেশকে স্থায়ীভাবে তিনবিঘা করিডোর হস্ড়ান্ড়রের বিষয়টি সিদ্ধান্ড় হিসেবে ছাড় দেয়। তবে চুক্তিটি বাস্ড়বায়নে অতিক্রান্ড় হয় প্রায় আরও দশটি বছর। ১৯৯০ সালের ৫ মে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট রায় দেয় যে, বাংলাদেশ তিনবিঘা করিডোর ব্যবহার করতে পারবে। অবশেষে ইন্দিরাণ্ঢ মুজিব চুক্তির দীর্ঘ ১৮ বছর পর ১৯৯২ সালের ২৫ মার্চ তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও বাংলাদেশের নাগরিকদের চলাচলের জন্য করিডোর ব্যবহার, ছিটমহল, বাংলাদেশের মূল ভূখন্ডের ভিতর দিয়ে যান চলাচল ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত একটি আচরণবিধি সম্বলিত প্রটোকলে স্বাক্ষর করেন।

১৯৯২ সালের ২৬ জুন খুলে দেয়া হয় করিডোর, যদিও সংযোগ স্থানের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে ভারতীয় সীমান্ড়রক্ষী বাহিনীর হাতে। আপাতত সাময়িক সমাধান হয় দহগ্রামণ্ঢআঙ্গরপোতা ছিটমহল সমস্যার। কিন্তু ঝুলে থাকে বাকী ছিটমহলগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ড়।

ছিটমহলবাসীর মুক্তির একমাত্র পথ ছিটমহল বিনিময়– এই স্লোগান তুলে ছিটমহল বিনিময়ের প্রথম দাবি তোলেন পশ্চিমবঙ্গের দিনহাটার সাবেক বিধায়ক প্রয়াত দীপক সেনগুপ্ত। ১৯৯৩ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ভারতণ্ঢবাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটি। ২০০০ সাল থেকে এই দাবির সমর্থনে গড়ে তোলেন তীব্র আন্দোলন। এর পর অন্যদের সাথে এই আন্দোলনের হাল ধরেন তাঁর পুত্র দীপ্তিমান সেনগুপ্ত। তিনি এখন এই কমিটির ডেপুটি সেক্রেটারি। তাঁরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন ভারতের অভ্যন্ড়রে থাকা বাংলাদেশের ছিটমহলবাসী ভারতের সাহায্যণ্ঢসহযোগিতা ছাড়া জীবন অতিবাহিত করতে পারবে না।

২০০৭ সালে ছিটমহল ও অপদখলীয় জমিগুলোতে যৌথ সফরের পর বাংলাদেশও ধাপে ধাপে বিষয়গুলো সুরাহার প্রস্ড়াব দেয়। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তালিকায় ক্রমানুসারে ছিল ছিটমহল বিনিময় এবং '৭৪ এর চুক্তির অন্য বিষয়গুলো। ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয় তারা সমন্বিতভাবেই বিষয়গুলো সমাধান করবে। ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯ নয়াদিলণ্ঢীতে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস.এম কৃষ্ণা ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনির মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সীমানা চিহ্নিতকরণ, ছিটমহল ও অপদখলীয় ভূমি বিনিময়ের বিষয়টি একটি প্যাকেজের আওতায় সমাধানে উভয়পক্ষ সম্মত হয়।

অবশেষে ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ ও ভারত উভয় রাষ্ট্র ঘোষণা দেয় যে, উভয় দেশের নিজ নিজ ভূখন্ডের ১৬২টি ছিটমহল পরস্পর বিনিময়ের মাধ্যমে এ সংক্রান্ড় সমস্যার সমাধান করতে হবে। এক্ষেত্রে ছিটমহলের অধিবাসীদের নাগরিকত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ড় তাদের উপরই ছেড়ে দেওয়ার বিধান রাখা হয়। বিনিময়ের প্রস্তুতি হিসেবে ১৫ জুলাই ২০১১ তারিখ থেকে শুরু হয় ছিটমহলে লোকগণনা। ছিটমহলবাসীদের মধ্যে দেখা যায় আনন্দের বন্যা। অথচ এর পর এক বছরেরও অধিক সময় অতিক্রান্ড় হলেও এ বিষয়ে অগ্রগতি থমকে দাঁড়ায়।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতি :

পঞ্চগড় জেলার ভূখন্ডে অবস্থিত ভারতের গায়তী ছিটমহলের অধিবাসীরা সাম্প্রতিক স্বেচ্ছা নাগরিকত্বের চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশী নাগরিকত্বের দাবিতে বাংলাদেশী পতাকা উত্তোলন করেছে। বাকী ১১০টি ছিটমহলেও একই ধরনের কর্মসূচি পালন করা হয়। ভারতণ্ডবাংলাদেশ ছিটমহল সমন্বয় কমিটির বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্ড়ফা দ্য ডেইলি স্টারণ্ডএর প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতের সব ছিটমহলের বাসিন্দারা পূর্ব সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিকত্ব বর্জন করেছেন এবং এটি তাদের চলমান ক্ষোভের একটি বহিঃপ্রকাশ। পঞ্চগড় সদরে গোলাম মোস্ড়ফা গায়তী ছিটমহলে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন এবং সেখানে গায়তী ছিটমহলের সভাপতি মফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। পরে ছিটমহলের বাসিন্দারা একটি মিছিল নিয়ে ছিটমহলের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এদিকে ১১১টি ছিটমহলের বাসিন্দাগণ সুনির্দিষ্ট দাবিতে গণঅনশন কর্মসূচি পালন করে। আন্দোলনকারীদের দাবি, ১৯৭৪ সালের ভারতণ্ডবাংলাদেশ সীমানা চুক্তি বাস্ড়বায়ন করতে হবে। এছাড়া উভয় দেশের ছিটমহলের অধিবাসীদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় উৎসব পালনের জন্য মুক্ত চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠন ছিটমহলবাসীদের দাবির প্রতি সংহতি জানিয়েছে। ওদিকে ভারতের অভ্যন্ড়রে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহলের অধিবাসীরাও ভারতীয় নাগরিকত্বের দাবিতে ১২ মার্চ ২০১২ থেকে কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার সংহতি ময়দানে অনশন কর্মসূচি পালন করেছে বলে জানিয়েছেন ভারতণ্ড বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটির (ভারতীয় অংশের) ডেপুটি সেক্রেটারি দীপ্তিমান সেনগুপ্ত। ফলে সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে ছিটমহলগুলো বিনিময়ে উভয় দেশের আশু ব্যবস্থা গ্রহণই হবে সবচেয়ে ভালো সমাধান।

সম্প্রতি ভারত থেকে আমদানীকৃত আর্টিকুলেটেড বাসের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সালমান খুরশিদ বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বৈঠকে তিস্ড়র পানি বণ্টন, স্থল সীমান্ড় চুক্তি বাস্ড়বায়ন ও ছিটমহলসহ অন্যান্য বিষয় স্থান পায়। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, স্থলসীমানা ও

ছিটমহল বিনিময় বিলটি ইতোমধ্যে ভারতের কেবিনেটে পাশ করা হয়েছে, সংসদের আসন্ন অধিবেশনেই এটি উত্থাপিত হবে।

অবরুদ্ধ জীবন, বিপন্ন মানবতা:

দীর্ঘ ছয় দশকের বঞ্চনার ইতিহাস বিশেণ্ডষণ করলে দেখা যায় ছিটমহলের অধিবাসীদের কথা ভুলে আছে উভয় দেশের সরকার। বছরের পর বছর ধরে রাষ্ট্রের রহস্যজনক মৌনতা ও উপেক্ষায় প্রকৃত অর্থে এরা পরিণত হয়েছেন নিজভূমে পরবাসী এবং রাষ্ট্রবিহীন নাগরিকে। তাদের না আছে সংবিধান স্বীকৃত অধিকার, না আছে মানবিক নিরাপত্তা, না আছে আন্ড়র্জাতিক আইনে স্বীকৃত মানবাধিকার। অধিকারহীনতাই যেন তাদের নিত্যসঙ্গী। সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ ও আন্ড়র্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ড় কনভেন্ট অনুযায়ী যেকোনো দেশের নাগরিকের তার দেশের অভ্যন্ড়রে এবং দেশের মূল ভূখন্ডের সঙ্গে স্বাধীনভাবে যাতায়াত/যোগাযোগের বিষয়টি একটি মৌলিক মানবাধিকার, যা প্রতিটি অনুস্বাক্ষরকারী দেশের জন্য অবশ্য পালনীয়।

কিন্তু ভারতের অভ্যন্ড়রে অবস্থিত বাংলাদেশী ছিটমহলের অধিবাসীরা বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের সামগ্রিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় ভারতের বিএসএফ ও বেসামরিক লোকজন দ্বারা। কেনাকাটার জন্য ব্যবহার করতে হয় ভারতীয় মুদ্রা। প্রায় একই ধরনের সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশের সীমানায় অবস্থিত ভারতের বিভিন্ন ছিটমহলের অধিবাসীরা। বছরের পর বছর ধরে যেন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ অবলীলায় ভুলে আছে তাদের এ সকল সমস্যাগুলোর ন্যূনতম সমাধানের কথা।

প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারের ওপর আত্মণ্ডনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বিষয়টি মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু ছিটমহলের অধিবাসীদের স্বাধীনভাবে তাদের ধান, পাট, রবিশস্য এবং অপরাপর প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও কেনাবেচা করার স্বাধীনতা নেই। তাই তারা মধ্যসত্ত্বভোগীদের কাছে অর্ধেক দামে তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

নির্যাতনবিরোধী কনভেশন এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারসংক্রান্ড় সনদে যেকোনো ধরনের শারীরিক, মানসিক ও আবেগগত নির্যাতন থেকে মুক্তিকে একটি অলঙ্ঘনীয় মানবাধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু বাস্ড়বে জুলুম নির্যাতনের ভয়ে অধিকাংশ ছিটমহলে নারীরা সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বের হন না। প্রতিবেশী অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ায় বিপদেণ্ডআপদে তাদের সহযোগিতা পাওয়ার উপায় নেই। পাশাপাশি দীর্ঘদিন বসবাস করলেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় অমোচনীয় মনস্ড়াত্ত্বিক বিভাজন, অবিশ্বাস ও সন্দেহ। এছাড়া রয়েছে মাস্ড়নণ্ডসন্ত্রাসীদের উপদ্রব। যখন তখন ছিটমহলে অনধিকার প্রবেশ করে নানা উপলক্ষে চাঁদা দাবি করা হয়। লুট করা হয় গরু, ছাগল, মাছ। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কেটে নেয়া হয় শস্য বা গাছপালা। অপরাধী ধরার নামে বিনাবিচারে আটক করা হয় বাসিন্দাদের। নারী ও শিশু নির্যাতন এবং অপহরণের মতো ঘটনাও এখানকার নিত্যদিনের ব্যাপার। এর ওপর আবার রয়েছে সীমান্ড়ে উত্তেজনার খড়গ। ভারতণ্ডবাংলাদেশ সীমান্ড়ে কোনো উত্তেজনা দেখা দিলেই তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় ছিটমহলগুলোতে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রৌমারী সীমান্ড় সংঘর্ষের কথা। ঐ সময় মশালডাঙ্গার অনেক ঘরণ্ডবাড়িত আগুন ধরিয়ে

> যে দেশের ছিটমহলই হোক না কেন এর অধিবাসীরা স্বস্ব দেশের সংবিধানসম্মত নাগরিক। শুধুমাত্র ভৌগোলিক অবস্থানের মালিকানা নয়; ছিটমহলে বসবাসকারী মানুষের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা উভয় রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সে দায় এড়ানোর কোনো অবকাশ নেই।

দেয়া হয়, ফলে প্রায় এক হাজার মানুষ জীবন বাঁচাতে মূল ভূখণ্ডে পালিয়ে আসেন। ছিটমহলের অধিবাসীরা বাংলাদেশের জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোট প্রদানের অধিকার থেকেও বঞ্চিত। বিচার ব্যবস্থা বলতে শুধু স্থানীয় সালিশ। এমনকি জমি কেনাবেচাও হয় সাদাস্বকাগজে লিখে অথবা মৌখিকভাবে। অধিকাংশ ছিটমহলে কোনো স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা নেই। সরকারি স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন সেবা এখানে দৃশ্যমান নয়। সর্বত্র আইনস্বৃঙ্খলার চরম অবনতি পরিলক্ষিত। দেশের মূল ভূস্বখণ্ডের লোকজন ছিটমহলবাসীদের সাথে বিয়েস্বসাদীতে রাজী হয় না। তাই উপযুক্ত পাত্রের অভাবে ঘনিষ্ট আত্মীয়স্বজন, এমনকি চাচাস্বভাতিজীর বিয়ের ঘটনাও হচ্ছে। বহু বিবাহও একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে এই বঞ্চিত জনপদে।

দুর্যোগকালীন সহযোগিতার অভাবে সবচেয়ে নাজুক মানবিক নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন ছিটমহলের নারী, শিশু ও প্রবীণরা। বছরের পর বছর অতিক্রান্ড় হলেও সরকারি কোনো কর্মকর্তার পদধূলি পড়ে না। যেমনস্ব ভারতের দাশিয়ার ছড়া ছিটমহলটিতে ১৯৫৮ সালের পর প্রশাসনিক কোনো কর্তাব্যক্তির পা পড়েনি। ছিটমহলবাসী অধিকাংশ শিশু ভুগছে পুষ্টিহীনতায়। সদ্যজাত শিশু ও প্রসূতি মায়ের মৃত্যুর হারও সেখানে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। অনেক গর্ভবতী নারীকে চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়। এমনটিও জানা গেছে, ভর্তি হতে না পেরে হাসপাতাল চত্বরেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে স্থানীয় বৈদ্য, কবিরাজই একমাত্র ভরসা। সব মিলে ছিটমহলের মানুষের জীবনযাপন খাঁচায় বন্দি থাকার মতো। সব মিলিয়ে কমবেশি উভয় দেশের ছিটমহলেই মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন ও প্রবঞ্চনার এমন চিত্র দৃশ্যমান। দীর্ঘদিন ধরে দেশস্ব বিদেশের নানা পত্রস্বপত্রিকায় এ সংক্রান্ড় অসংখ্য সরেজমিন প্রতিবেদন, গবেষণাপত্র প্রকাশিত হলেও রাষ্ট্রযন্ত্র নির্বিকার।

প্রস্তাবনা :

বাংলাদেশ বা ভারতস্ব উভয় দেশের ছিটমহলগুলো আয়তন, জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভৌগোলিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে স্বকীয় চরিত্রের হলেও সর্বক্ষেত্রে একই ধরনের সমস্যা বিদ্যমান। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট ভূখণ্ডগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও নিকট অতীতের আবহমান ঐতিহ্যের ধারায় সংশিস্বষ্ট দেশের ছিটমহলবাসীর রয়েছে মূল ভূখণ্ডের মানুষের সাথে জীবনযাপন, রীতিস্ব আচার ও সংস্কৃতির অভিন্নতা। ফলে উভয় দেশের ছিটমহলগুলো সংশিস্বষ্ট দেশের মূল ভূখণ্ডের সাথে অধিভুক্ত করে নেয়াই হবে সবচেয়ে যৌক্তিক সমাধান। ছিটমহলবাসীদের সাম্প্রতিক দাবিতেও এই বিষয়টি মূর্ত হয়ে উঠেছে।

যে দেশের ছিটমহলই হোক না কেন এর অধিবাসীরা স্বস্ব দেশের সংবিধানসম্মত নাগরিক। শুধুমাত্র ভৌগোলিক অবস্থানের মালিকানা নয়; ছিটমহলে বসবাসকারী মানুষের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা উভয় রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সে দায় এড়ানোর কোনো অবকাশ নেই। এতে নাগরিকদের সন্তুষ্টি বিধান ঘটবে এবং তারা সংশিস্বষ্ট রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। উভয় রাষ্ট্র সমঝোতার ভিত্তিতে ছিটমহল বিনিময় করলে তা হবে লাভজনক। কেননা এতে উভয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ভৌগোলিক মানচিত্রসংক্রান্ড় দীর্ঘদিনের জটিলতার অবসান ঘটবে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত সীমান্ড় বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটবে। ছিটমহলে বসবাসকারী অধিবাসীদের প্রশাসনিক ও নাগরিক মর্যাদা নিশ্চিত করা উভয় রাষ্ট্রের জন্য লাভজনক। এতে উভয় দেশের দ্বিস্বপাক্ষিক সম্পর্কে স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে; এড়ানো যাবে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। রোধ করা যাবে সীমান্ত উত্তেজনা, দুর্ঘটনা, চোরাকারবারি, মানবপাচার, কালোবাজারি ও অবৈধ অনুপ্রবেশের মতো ঘটনাগুলো। রাষ্ট্র অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে এখানকার অধিবাসীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে লাভবান হতে পারে। জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারলে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির সূচক বৃদ্ধি পাবে।

চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ড় উভয় রাষ্ট্রের ছিটমহলবাসীদের জন্য খাদ্য, শিক্ষা, গৃহায়ন, সড়কস্বযোগ, বিদ্যুৎ, পানি, স্বাস্থ্যসেবাসহ বিবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম, অবকাঠামো নির্মাণের কাজগুলো সরকারি উদ্যোগে অগ্রাধিকার বিবেচনায় ধাপে ধাপে এগিয়ে নিতে হবে। প্রশাসনিক তৎপরতা বাড়িয়ে নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ও মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। উভয় দেশের অধিবাসীদের মূল ভূখণ্ডে স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। অকারণে কেউ যেন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার না হয় বা তার নাগরিক অধিকার লঙ্ঘিত না হয় তা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। দু' দেশের ছিটমহল বিনিময় কমিটি একটি পর্যবেক্ষণ সেল গড়ে তুলে এ ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্র মতে, দু'দেশের মধ্যে ছিটমহল সমস্যার সমাধান হলে বাংলাদেশের অভ্যন্ড়রে থাকা ভারতের ১১১টি ছিটমহল বাংলাদেশ পাবে এবং ভারতের অভ্যন্ড়রে থাকা বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল ভারত পাবে। ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যুক্তি দিয়েছে ছিটমহল বিনিময় হলে ভারত ৪২ বর্গকিলোমিটার এলাকা হারাবে। পরিসংখ্যানের খাতিরে এই যুক্তি সঠিক। কিন্তু রাজনৈতিক বিশেস্বষক ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেকবান মানুষদের মতে, প্রায় ৩,৩০,০০০০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের বিশাল ভূস্বখণ্ডের রাষ্ট্রটির এই সমঝোতার মূল্যে নিষ্পত্তি ঘটতে পারে দীর্ঘদিনের জটিল সমস্যার। মানবিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে উভয় দেশের নিগৃহীত কয়েক হাজার মানুষ। এইটুকু ছাড় দেয়ার মতো সভ্যতায় কি আমরা এখনো পৌঁছায়নি?

অজুহাত বা কালক্ষেপণ নয়; পারস্পারিক বিনিময় বন্দোবস্ড়ের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত এ সমস্যাটির আশু স্থায়ী সমাধান উভয় রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব। দুই দেশের চলমান বাণিজ্য চুক্তি বা দ্বিস্বপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোও এতে গতিশীল হবে। উভয় দেশের ছিটমহলবাসী ভারতের সংসদে দীর্ঘ প্রত্যাশিত বিলটি পাস হওয়ার আশায় প্রহর গুনছে।

ড. মো. মিজানুর রহমান: শিক্ষক ও গবেষক।
ইস্বমেইল: mizanrah68@gmail.com

বাংলাদেশ যখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় কারাগার

আলতাফ পারভেজ

বাংলাদেশকে ঘিরে ফেলছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সীমান্ত প্রাচীর

প্রায় ৪০৯৫ কিলোমিটার (স্থলে ২৯৭৯, জলে ১১১৬) জুড়ে থাকা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দুটি আলাদা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ঘোষণা করলেও স্থানীয় জনপদ ততটা আলাদা নয়। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম সীমান্তে কয়েক হাজার পরিবার সীমান্তের দু'পারে কৃত্রিমভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে আছে। 'সীমান্ত' হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার আগে অতীতকাল থেকেই বর্তমান সীমান্তে দু'পাড়ে এসব পরিবারের আত্মীয়তার বন্ধন ছিল, ছিল অর্থনৈতিক কর্মকা-ও। কথিত 'সীমান্ত' অনেক পরিবারের একবারে উপর দিয়ে গেছে। যে কারণে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বরাবরই এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে 'অমানবিক সীমান্ত' হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়।

এসব বিবেচনা সত্ত্বেও ১৯৮৬ সাল থেকে ভারত বাংলাদেশের চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করে। দিল্লীতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারে বারংবার রাজনৈতিক পালাবদল ঘটলেও কংগ্রেস-বিজেপি সবাই বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর প্রকল্পে ঐক্যমত বজায় রাখে। কাঁটাতারের স্বপক্ষে ভারতীয় রাজনীতিবিদরা যেসব বক্তব্য দিয়ে থাকেন তা ইসরায়েলী ও প্যালেস্টাইন সীমান্তে দেয়াল নির্মাণের পক্ষে ইসরায়েলী নেতৃবৃন্দের বক্তব্যের অনুরূপ।

তবে ইসরায়েল ও প্যালেস্টাইন সীমান্তে নির্মিত দেয়ালের চেয়ে (নির্মাণ শেষে এই দেয়ালের পুরো দৈর্ঘ্য হবে ৭৬০ কিলোমিটার) বাংলাদেশের চারিদিকে তৈরি কাঁটাতারের দেয়াল অনেক বড়। এমন কি যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো সীমান্তে নির্মিতব্য দেয়ালের দৈর্ঘ্যের চেয়েও বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত দেয়ালের দৈর্ঘ্য অনেক বেশি। ভারত পাকিস্তানের সাথে তার সীমান্তেও ১৮০০ মাইল জুড়ে দেয়াল নির্মাণের প্রকল্প নিয়ে এগোচ্ছে, তবে বাংলাদেশের সীমান্তেই তার এরূপ প্রকল্পে অগ্রগতি বেশি এবং ইতিমধ্যে ভারত কর্তৃক নির্মিত এই সীমানা প্রাচীর বিশ্বের সর্ববৃহৎ আন্তঃসীমান্ত দেয়াল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন সীমান্তে নির্মিতব্য দেয়াল এবং যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো সীমান্তে নির্মিতব্য দেয়াল নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দুটি দেশে এবং বিশ্বজুড়ে সংশ্লিষ্ট সরকার ও মানবাধিকার কর্মীরা সোচ্চার হলেও আমাদের দেশে এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য নেই। কেবল একবার ২০১০ সালের ১৫ মে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব আব্দুস সোবাহান শিকদার বলেছিলেন যে, 'কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণকালে ভারত অন্তত ৪৬ স্থানে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে'। (দেখুন, ডেইলী স্টার, ১৬ মে ২০১০)। উপরোক্ত বক্তব্য প্রদানকালে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র সচিব এও জানিয়েছিলেন যে, কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণকালে সীমান্তের জিরো পয়েন্টের ১৫০ গজের মধ্যে কোনো ধরনের কাঠামো না নির্মাণের যে আইনগত বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘিত হয়েছে, সেটা ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে জরিপ করেও অন্তত ১২ স্থানে প্রমাণিত হয়েছে।

কাঁটাতারের প্রাচীর এক ধরনের বর্ণবাদিতার স্মারক

১৯৮৯ সাল থেকে সীমান্ত প্রাচীর নির্মাণের কার্যক্রম পুরোপুরি শুরু হয়। প্রথমে ৩.৭ বিলিয়ন রুপি এখাতে বরাদ্দ দেওয়া হলেও পরে ধাপে ধাপে এই বরাদ্দ কয়েক গুণ বেড়ে ১০.৫ বিলিয়ন রুপিতে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হয়। কয়েকটি পর্যায়ে সমাপ্ত এই কার্যক্রমে ভারত কেবল কাঁটাতারের বেড়াই নির্মাণ করেনি, বেড়া ঘেঁষে সামরিক যান চলাচলের উপযোগী রাস্তাও নির্মাণ করেছে। এ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া স্থাপন সম্পন্ন হয়ে গেছে। বেঁড়াগুলো তিন মিটার উঁচু করে নির্মিত। বেড়ার আশেপাশে আনুষঙ্গিক অনেক স্থাপনা নির্মিত হবে। ভারতে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে ২০০৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর স্থানীয় নাগরিকরা এ সম্পর্কিত যেসব তথ্য প্রকাশে ভারত সরকারকে বাধ্য করে, সেসব তথ্যে দেখা যায়, দেশটি বাংলাদেশকে ঘেরাও করে ফেলার জন্য ঐ সময় পর্যন্ত ৫২০৫.৪৫ কোটি রুপি অর্থ বরাদ্দ শেষ করেছে এবং সর্বমোট ৩৪৩৬.৫৯ কিলোমিটার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেয়া হবে বলে তখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত রয়েছে। পরবর্তীকালে ভারতীয় বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, কাঁটাতারের প্রাচীর নির্মিত হবে সর্বমোট ৩৭৮৩ কিলোমিটার সীমান্তে।

ভারতীয় লোকসভায় তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর এক বিবৃতি থেকে দেখা যায়, কেবল ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের দেশটি বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার খাতে ২৪০৪.৭০ মিলিয়ন রুপি অর্থ ব্যয় করেছে। আসাম অঞ্চলে কয়েকটি স্থানে কাঁটাতারের বেড়া বিদ্যুতায়িতও করা হয়েছে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র যখন মেক্সিকো সীমান্তে বেড়া বা দেয়াল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় তখন সেখানে দু'দফায় অন্তত দুটি আইন করা হয়। সর্বশেষ যে আইনের মাধ্যমে এই কার্যক্রম শুরু হয়, তা হলো 'সিকিউর ফেন্স এক্ট ২০০৬'। ২০০৬ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে এই আইন কার্যকর হয়। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে নয়, স্রেফ প্রশাসনিক উদ্যোগে ভারত বাংলাদেশকে ঘেরাও করে ফেলার এইরূপ একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল বা বেড়া নির্মাণের কথিত যুক্তি ছিল মেক্সিকো থেকে মাদকের চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ করা, আর ইসরায়েল কর্তৃক পশ্চিম তীরে দেয়াল তৈরি হয় কথিত সন্ত্রাসী হামলা বন্ধ করার কথা বলে। অথচ বাংলাদেশ সীমান্তে, বাংলাদেশের তরফ থেকে ভারতে এইরূপ সমস্যার কোনোটিই হয় না। বরং ভারত থেকেই বাংলাদেশে ফেনসিডিল, অস্ত্রসহ নানা ধরনের জিনিস চোরাচালান হয়ে আসে যা বাংলাদেশে নিরাপত্তার জন্য হুমকি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশ কখনোই সীমান্তে এইরূপ অবকাঠামো গড়ে তোলার দাবি জানায়নি।

ভারত কর্তৃক প্রায় দু'দশক ধরে কাঁটাতার দেয়ার কার্যক্রম চললেও সে বিষয়ে নীরবতা বজায়ে রেখেই বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকরা ভারতকে করিডোর সুবিধা দেয়ার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। অথচ সীমান্তে এভাবে সর্বব্যাপক কাঁটাতারের বেড়া ও সড়ক নির্মাণ ১৯৭৪ সালের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তিরও লঙ্ঘন- ১৯৯৭ সালে মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও যে চুক্তিকে আজো ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের দিক-নির্দেশনা হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। ঐ চুক্তি অনুযায়ী কোনো দেশ অপরের জন্য হুমকিমূলক সামরিক অবকাঠামো গড়ে তুলতে পারবে না। কিন্তু ভারত স্পষ্টত প্রায় পুরো সীমান্ত জুড়ে এই চুক্তির অতীত অবস্থান থেকে সরে গেছে। এমনকি ভারত তার বিভিন্ন সীমান্তে ইসরায়েল থেকে পাওয়া MÖvDÛ সেন্সর টেকনোলজি ব্যবহার করছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত বর্তমান পত্রিকা (০৬.০৫.২০১১)-এর এক সচিত্র প্রতিবেদনে বিএসএফ-এর কোচবিহার সীমান্তের ভারপ্রাপ্ত ডিআইজি অশোক কুমারের বরাত দিয়ে জানানো হয় যে, সীমান্তে তারা এমন সব থার্মাল ইমেজার ব্যবহার করছে যা রাতেও বাংলাদেশের কয়েক কিলোমিটার ভেতরে অনায়াসে নজরদারি করতে সক্ষম। ১৫.১০.২০০৬ তারিখে জি নিউজ সূত্রে জানা যায়, বিএসএফ শুধু বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারির জন্য ৯০০ 'হ্যান্ড-হেল্ড থার্মাল ইমেজার' ক্রয় করছে, যে যন্ত্রের প্রতি সেটের মূল্য ২৮ লাখ রুপি। মানুষের শরীরের উত্তাপ থেকেই তাকে শনাক্ত করতে সক্ষম এই যন্ত্র। এ ছাড়াও বিএসএফ সীমান্তের জন্য ইসরায়েলের তৈরি দূরপাল্লার LORROS (Long-range reconnaissance and observation system) প্রযুক্তি সংগ্রহ করেছে যার সাহায্যে সীমান্তের ৪০ মাইল জুড়ে নিবিড় নজরদারি করা যায়। এরকম অন্তত ২৭ সেট রাডারভিত্তিক প্রযুক্তি যার প্রতি সেটের দাম ২ কোটি রুপি। কেবল কারিগরি দিক থেকে নয়, মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষাও ভারত কর্তৃক সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় ভূলুণ্ঠিত। যেখানে প্রথম অনুচ্ছেদেই 'দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও বন্ধুত্ব,' 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান'-এর পাশাপাশি 'অপরের প্রতি বর্ণবাদী মনোভাব' পোষণ না করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হাজার হাজার মাইল জুড়ে বাংলাদেশীদের ঘিরে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ মোটেই বন্ধুত্বের স্মারক নয়- একইসাথে তা এক ধরনের বর্ণবাদী ঘৃণারও প্রকাশ। বিশ্ববাসী দেখছে, ইসরায়েল অনুরূপ ঘৃণার প্রকাশ ঘটিয়েছে আরবদের প্রতি, যুক্তরাষ্ট্রও একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে সীমান্তঘেঁষা মেক্সিকোর গরীব মানুষের প্রতি।

কাঁটাতারের বেড়ার কারণে জীববৈচিত্র্যে বিপর্যয়

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার কর্মীরা যেসব যুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো এবং ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন সীমান্ত বেড়ার বিরোধিতা করছেন তার সবগুলোই বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তেও উপস্থিত। যেমন- যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল নির্মাণের কারণে তিনটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ আত্মীয়-স্বজনগতভাবে বিভক্ত এখন। স্মরণাতীতকাল থেকে সীমান্ত এলাকার মানুষ আশেপাশের গ্রামে বিয়ের মাধ্যমে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। তারা ভাবতেও পারেনি যে, একই ভাষাভাষী ও জাতিসত্ত্বার মাঝে এরূপ একটি দেয়াল নির্মিত হবে। ফলে এসব পরিবার এখন পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এরূপ অস্বাভাবিক বিভক্তি তাদের অর্থনৈতিক জীবনেও দীর্ঘস্থায়ী বিপন্নতা তৈরি করেছে। ভারতের এই কাঁটাতারের বেড়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবনকেও বিভক্ত করবে- যা ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক পরিসরে পরিবেশবাদীদের মাঝে বড় ধরনের উদ্বেগ তৈরি করেছে। কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য আনুষঙ্গিক উপাদান পরিবহনের জন্য সুন্দরবনের প্রাণবৈচিত্র্য নিশ্চিতভাবেই হুমকির মুখে পড়বে। বাঘসহ অনেক প্রাণী কাঁটাতারের বেড়ার কারণে বিচরণভূমি হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আবার কাঁটাতারের বেড়ায় বিদ্যুৎ প্রবাহ চালু করা হলে অতি অল্প সময়ে সেখানে প্রাণ বৈচিত্র্য হারিয়ে যাবে। উল্লেখ্য, কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের আগে বা পরে বাংলাদেশ কখনো এই প্রকল্পের পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কোনো উদ্যোগ নেয়নি। অথচ আমাদের দেশে পরিবেশ বিষয়ক একটি অধিদপ্তররয়েছে। কাঁটাতারের বেড়া খুলনা-

বাংলাদেশের মতো প্রায় পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ সীমান্তে একটি অতি ব্যয়বহুল বেড়া নির্মাণ থেকে কল্পিত নিরাপত্তা খোঁজার যে চেষ্টা ভারত করছে তার সর্বোত্তম বিকল্প হতে পারতো দু দেশের মাঝে নায্য সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে বন্ধুত্ব ও আস্থার মনোভাব সৃষ্টি।

সাতক্ষীরার সুন্দরবন সন্নিহিত অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক নৃ-গোষ্ঠী, যেমন- বাওয়ালী, মৌয়ালদের রুটি-রুজিতেও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, কারণ এসব জনগোষ্ঠী স্মরণাতীতকাল থেকে সুন্দরবনের প্রাণ সম্পদের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে।

কাঁটাতারের বেড়া: সমরবাদী মনস্তত্ত্বের ফল

বলাবাহুল্য যেকোনো অপরিণামদর্শী ও মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী প্রকল্পের উৎস বরাবরই হয়ে থাকে সামরিক-আমলাতান্ত্রিক মনোভাব থেকে। যে কারণে দেখা যায়, বিশ্বে মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সবচেয়ে বেশি আলোচিত তিনটি সীমান্ত প্রাচীর নির্মাণকারী দেশই একই ধাঁচের এবং পরস্পর নানা সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ। লক্ষ্যণীয় যে, তাদের মাঝে যতধরনের সহযোগিতামূলক প্রকল্প রয়েছে তার প্রায় সবগুলোই সামরিক ধাঁচের। অর্থাৎ, এই তিনটি দেশই যাবতীয় সমস্যা ও সম্ভাবনাকে সামরিক চোখে দেখে থাকে। অথচ বাংলাদেশের মতো প্রায় পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ সীমান্তে একটি অতি ব্যয়বহুল বেড়া নির্মাণ থেকে কল্পিত নিরাপত্তা খোঁজার যে চেষ্টা ভারত করছে তার সর্বোত্তম বিকল্প হতে পারতো দু দেশের মাঝে ন্যায্য সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে বন্ধুত্ব ও আস্থার মনোভাব সৃষ্টি। কিন্তু ভারতে শাসনকেন্দ্রে জেঁকে বসা দক্ষিণপন্থি সামরিক-আমলাতান্ত্রিক মনোভাব সে পথে যাবে বলে মনে হয় না।

আলতাফ পারভেজ: লেখক ও গবেষক।
ই-মেইল: altafparvez@yahoo.com

সমকালীন প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গা ইস্যু

গণতন্ত্রের মোড়কে মিডিয়া ও ক্ষমতার ভাগাভাগি কারসাজি

নূর-এ-জান্নাতুল ফেরদৌস রুহী

মাতৃভূমিতেই রিফিউজি!

মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর সম্প্রদায় 'রাখাইন' ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা 'রোহিঙ্গা' নামে পরিচিত। প্রায় চারশ বছর ধরে রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠী মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলের এই রাখাইন রাজ্যে বসবাস করছে। পুরোনো দলিলপত্র থেকে জানা যায়, ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত এ অঞ্চলে রোহিঙ্গা বা রোসাঙ্গ নামের একটি স্বাধীন রাজ্যও ছিল। সে রাজ্য শাসনের অধিকার ছিল একমাত্র রোহিঙ্গাদেরই। মিয়ানমারের রাজা বোদাওয়াফা এ অঞ্চল দখল করার পর সেখানে বৌদ্ধ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা পেয়ে বার্মা বহুদলীয় গণতন্ত্রে যাত্রা করে। এমনকি সেসময় পার্লামেন্টে রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধিত্বও ছিল।

জেনারেল নে উইনের সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৬২ সালে এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র পুরোটাই পাল্টে যায়। মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার সুযোগ থেকে রোহিঙ্গাদের বঞ্চিত করা হয়। কেড়ে নেওয়া হয় ভোটাধিকার। জন্ম নিবন্ধন বাতিল হয়। এমনকি নিঃসংকোচে জাতিগত পরিচয় প্রকাশের অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়। এভাবে বিরাট একটা সম্প্রদায়ের মানবাধিকার ছিনিয়ে ১৯৭৭ সালে মিয়ানমারের কেন্দ্রীয় সরকার দেশে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করলে রোহিঙ্গারা নিজ দেশেই হয়ে যায় রিফিউজি! আর এ ঘোষণার পর থেকে রাখাইন বৌদ্ধ এবং মিয়ানমার সরকার-সেনাবাহিনী একত্রে রোহিঙ্গাদের ওপর অন্যায়ভাবে নির্যাতন নিপীড়ন শুরু করে।

মিডিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠের কণ্ঠস্বর

গত জুলাইয়ে একজন রাখাইন নারী কয়েকজন মুসলিম যুবকের দ্বারা ধর্ষিত হয়ে নিহত হয়েছেন বলে মিডিয়ায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই সংবাদ প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দিনের আলো থাকতে থাকতেই রাখাইন বৌদ্ধরা রোহিঙ্গাদের একটি বাসে আগুন দিয়ে ১০জন রোহিঙ্গা মুসলিমকে পুড়িয়ে মেরে ফেলে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো, হত্যা করা রাখাইন নারীটি একজন রোহিঙ্গাকে বিয়ে করেছিল বা কোনো রোহিঙ্গাকে পছন্দ করতো। আর এই কারণবশত রাখাইন বৌদ্ধরা সেই নারীটিকে হত্যা করে লাশ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ফেলে রেখে গিয়েছিল বলে সেদেশের নিরাপত্তা বাহিনী এটা নিশ্চিত করে। যাহোক, রাখাইন বৌদ্ধদের দ্বারা সাম্প্রতিক এই দাঙ্গার সূত্রপাতটা এভাবেই।

মিয়ানমারের সরকারি মিডিয়া ১০জন রোহিঙ্গা মুসলিমকে হত্যার এই ঘটনাকে 'কালা' (kala) হিসেবে অভিহিত করে। এটা রাখাইন সমাজের একটা তাচ্ছিল্যসূচক শব্দ। রোহিঙ্গা হত্যার এই খবর ইরানি কিছু ওয়েব সাইটে দেখা যায়, যেগুলোর কিছু লেখা এশিয়ার পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। টিভিতেও এই ঘটনার কাভারেজ দেখা যায়। কিন্তু রয়টার, নিউ ইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, কিংবা ফক্স নিউজে মুসলমানদের হত্যার এই খবর পাওয়া যায় না! মিয়ানমারের মিডিয়ার সেন্সরশীপের এই স্পষ্টত প্রতীয়মান অবস্থানের সাথে সাথে পশ্চিমা মিডিয়াও রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর এই নৃশংস অত্যাচারের চিত্র থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখে। এতে আরেকবার তাদের শক্তিশালী মুসলিম-বিরোধী নীতি ও মানবাধিকার সম্পর্কে তাদের বিকল্প আচরণটা সামনে উঠে আসে। একইসাথে এই ঘটনার ঠাঁই হয় না ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া বা কানাডার কোনো মিডিয়াতেও।

রাখাইন-রোহিঙ্গা দাঙ্গার মিডিয়া কাভারেজ মানেই শুধু রাখাইনদের গ্রাম, ঘর পোড়ানোর ছবি। ক্যাপশনে, সংবাদের স্টোরিতে অনায়াসে এগুলোর দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয় রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর। মিডিয়ার সনাতন একপাক্ষিক চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শোনা যায়, সংখ্যাগরিষ্ঠের কণ্ঠস্বর! মিডিয়ায় সংখ্যালঘুর এই বৈষম্যমূলক উপস্থিতিই সমাজে রোহিঙ্গা মুসলিমকে নেতিবাচক হিসেবে দেখার প্রক্রিয়াকে আরও খুরধার করে। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহজেই বিষাদপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা বলিষ্ঠ অস্ত্র এটাকে দাঁড় করিয়ে দেয়।

পশ্চিমের লেজে সুচির গণতন্ত্র-দর্শন, নোবেল পদকের কূটনৈতিকতা!

অদূর ভবিষ্যতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল হবে স্নায়ুযুদ্ধের কেন্দ্র- অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকই এমনটা মনে করেন। এটা যদি সত্যি হয়, তবে এই স্নায়ুযুদ্ধের নেতৃত্বে পরস্পরবিরোধী ভূমিকায় থাকবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা দেশগুলো এবং এশিয়ার অন্যতম পরাশক্তি চীন। এই সমীকরণে মিয়ানমার পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ চীনের একটি সীমান্তবর্তী দেশ হলো এই মিয়ানমার। এবং মিয়ানমারের সাথে চীনের দীর্ঘকাল ধরে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই চীনকে ভবিষ্যতে প্রতিহত করতে হলে মিয়ানমারকে পশ্চিমা দেশগুলোর বিশেষ প্রয়োজন।

২১ বছর আগেই তাই পশ্চিমের এই শক্তিধর দেশগুলো নিজেদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রচেষ্টায় গৃহবন্দী অং সান সুচিকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে এই দেশকে তার মিত্র হিসেবে তৈরি করার ভিত রচনা করে রেখেছে।

১৯৮৮ সালে মিয়ানমারের জনগণের আহবানে সাড়া দিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতা জেনারেল আউং সানের কন্যা অং সান সুচি। তার নেতৃত্বে শুরু হয় স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলন। জান্তা সরকার ১৯৮৮ সালের ৮ আগস্ট এক নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে অত্যন্ত কঠোরভাবে এ আন্দোলন দমন করেন। কিন্তু এরপরও জনগণের ক্রমাগত চাপে ১৯৯০ সালে জান্তা সরকার বহুদলীয় নির্বাচন দেয়। নির্বাচনে সুচি জয়ী হন। কিন্তু ক্ষমতা পাওয়ার বদলে তাকে হতে হয় গৃহবন্দী।

সামরিক শাসনের অধীনস্ত এই দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ফ্রান্স, জার্মানি ও যুক্তরাজ্য, এমনকি ইউরোপীয় ইউনিয়নও। ২০১০ সালে বিতর্কিত একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে সেখানে ক্ষমতায় আসে বেসামরিক সরকার। এই সরকারের প্রতি সামরিক বাহিনীর সমর্থন ছিল। কিন্তু ক্ষমতায় এসেই গণতন্ত্রপন্থি নেতা সুচিকে গৃহবন্দি থেকে মুক্তি দিলে এবং পরবর্তীতে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে বিশ্ব নেতাদের কাছে সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন থেইন সেইন ও তার সরকার। আর এর পুরস্কার হিসেবে আবারও পশ্চিমা দেশগুলো হাজির হয়েছে তাদের রাজনীতির কূটনৈতিক কৌশলের হাতিয়ার সেই নোবেল শান্তি পদক নিয়ে! বর্তমানে থেইন সেইন নোবেল শান্তি পুরস্কারের অন্যতম দাবিদার!

> ২০১৫ সালে মিয়ানমারে নির্বাচন আসছে।... সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর সমর্থন তিনি হারাতে চান না। আর এ কারণেই সংখ্যায় কম রোহিঙ্গাদের এসব ঘটনাকে তিনি বিচ্ছিন্ন ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের ফল হিসেবে দেখতেই পছন্দ করছেন।

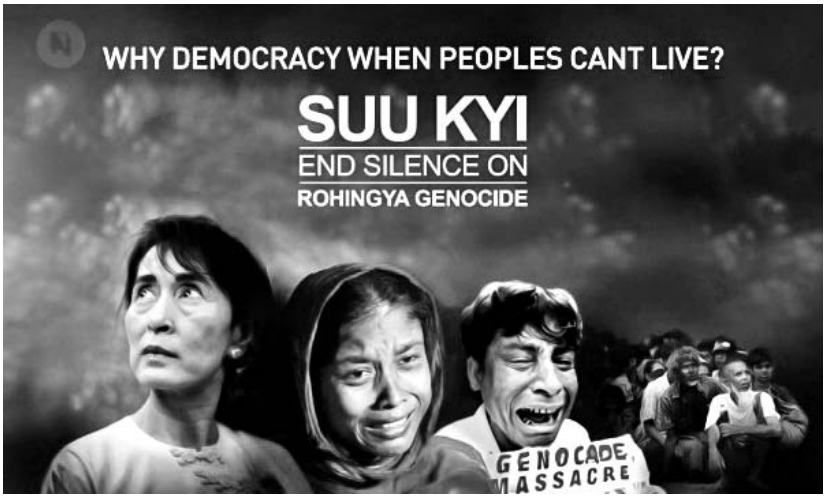

এমন একটি সাজানো পরিপাটি মঞ্চে যুক্তরাষ্ট্র চায় সুচিই হোক দেশটির ভবিষ্যত কর্ণধার। তাকেই মার্কিনরা পাশ্চাত্যবান্ধব এবং মার্কিন স্বার্থ রক্ষায় সুবিধাজনক মনে করছে। আর সুচিও এখন ক্ষমতা চান! ২০১৫ সালে মিয়ানমারে নির্বাচন আসছে। সেই নির্বাচনের প্রার্থী গণতন্ত্রের জন্য ব্যক্তিগত জীবন ত্যাগ করা অং সান সুচি। সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর সমর্থন তিনি হারাতে চান না। আর একারণেই সংখ্যায় কম রোহিঙ্গাদের এসব ঘটনাকে তিনি বিচ্ছিন্ন ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের ফল হিসেবে দেখতেই পছন্দ করছেন।

গণতন্ত্র, ক্ষমতা ও দখলদারিত্বের মেকানিজম-মাত্র

মিয়ানমার সরকার এবং এর জনগণের বড় একটা অংশ রোহিঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায়কে মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং ৮ লাখ রোহিঙ্গাকে প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে প্রবেশ করা অধিবাসী বলে অভিহিত করেছেন। বাংলাদেশও রোহিঙ্গাদের বাসস্থান দিতে আন্তরিক নয়। ফলে রোহিঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায় বিশ্বের একমাত্র সম্প্রদায় হিসেবে ভাসমান জীবনযাপন করছেন। যাদের নিজেদের থাকার স্থায়ী কোনো আবাস নেই! নেই কোনো রাষ্ট্র!

দীর্ঘসময় পর্যন্ত নীরব থাকার পর সুচির কণ্ঠেও এমন সুর পাওয়া যায়। অকপটে তিনিও বলেন, বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারে অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ হতে হবে। তা না হলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব না। রোহিঙ্গা মুসলিমরা সীমান্তের দুই পাশে অবস্থান করছে জানিয়ে তিনি বলেন, জাতিগত দাঙ্গার পর সমঝোতা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে তার পক্ষে রোহিঙ্গাদের সমর্থন করা সম্ভব নয়। বাস্তবিক অর্থেই সাম্প্রদায়িক নিরপেক্ষতা দেখানো গণতন্ত্রের জন্য আত্মত্যাগী সুচির পক্ষে অসম্ভব। কারণ মানবাধিকারের জন্য কাজ করা এই নেতা ধর্মের সীমানা থেকে কখনো বের হয়ে আসতে পারেননি: "যদি ধারণা এবং বিশ্বাস ভৌগোলিক সীমা আর সাংস্কৃতিক পরিসরের দ্বারাই সীমিত হয়ে আসে, তাহলে বৌদ্ধ মতবাদ শুধুমাত্র উত্তর ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো, একইভাবে খ্রিস্টীয় মতবাদের অবস্থান হতো শুধুই মধ্যপ্রাচ্যে এবং ইসলাম থাকতো আরবের গ্ন্তিতে।"

যাহোক, মানবাধিকার লঙ্ঘন হওয়া এমন একটি ইস্যু নিয়ে কোনো দেশকেই কোনো রাজনৈতিক পরামর্শ, কূটনৈতিক সমাধান দেওয়ার জন্য লেখা নয়। শুধু দেখানো হয়েছে, গণতন্ত্র সবসময়, সবজায়গায় ক্ষমতা দখলের একটা প্রক্রিয়া। জনগণকে পকেটে ভরে তার দোহাই দিয়ে ক্ষমতা দখলকে বৈধ করার একটা মসৃণ মেকানিজম মাত্র! এমনকি যে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিবিশেষ নোবেল পদকও অর্জন করেছেন, সেই দেশের আপামর মুক্তিকামী জনগণও এই তালিকা থেকে বাদ যায়নি! সুচির একটা বিখ্যাত মন্তব্যই এর যথার্থতা বোঝাতে সক্ষম:

'এটা এমন কোনো ক্ষমতা নয় যেটা কোনো ধরনের দুর্নীতি সংঘটিত করে; এটা আসলে একটা ভয়। এই ভয়টা আসলে ক্ষমতা হারানোর ভয়। এটা আসলে যারা ক্ষমতার ব্যবহারকারী তাদের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ভয়। (ফ্রিডম ফ্রম পাওয়ার, ১৯৯০)।

নূর-এ-জান্নাতুল ফেরদৌস রুহী : সাংবাদিক।
ই-মেইল : jannatulruhi@gmail.com

থামবে কবে সীমান্তে হত্যা?

ইন্দিরা হক

বর্ডারণ্টকিলিং বা সীমান্ড়ে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশিদের হত্যা সীমান্ত এলাকার মানুষের মানবাধিকার ও নিরাপত্তার জন্য বহুল আলোচিত একটি বিষয়। বারবার আশ্বাস আর প্রতিবাদ সত্ত্বেও সীমান্ড়ে হত্যাকান্ডের ঘটনা কোনোভাবেই কমছে না। ২০১২ সালে বাংলাদেশণ্টভারত সীমান্তে ৪০ বাংলাদেশিকে হত্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৮ জন নিহত হয়েছেন ভারতীয় সীমান্ড়রক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলি ও নির্যাতনে, অন্য দুজন নিহত হয়েছেন ভারতীয় বেসামরিক নাগরিকদের হাতে। বেসরকারি সংস্থা AwaKviণ্টএর তথ্যানুযায়ী, ২০১২ সালে সীমান্ড়ে বিএসএফের নির্যাতনে ১০০ এবং ভারতের বেসামরিক নাগরিকদের নির্যাতনে ১০ বাংলাদেশি আহত হয়েছেন। এছাড়া ৭৪ জন বাংলাদেশিকে অপহরণ করার তথ্যও AwaKvi তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে। সীমান্ড়ে নিহতের সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনার ক্রমাগত আশ্বাস সত্ত্বেও এতো মানুষের অস্বাভাবিক মৃত্যু আর কত দিন অব্যাহত থাকবে?

সীমান্ড়ে হত্যাকান্ডের কারণ কী?

চোরাচালান বর্ডারণ্টকিলিংয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। গরু বা অস্ত্র ছাড়াও ড্রাগস এবং বিভিন্ন পণ্য চোরাচালানের জন্য সীমান্ড়বর্তী এলাকাগুলোর কোনো বিকল্প নেই। চোরাচালানি চক্র তাদের এই কাজে ব্যবহার করে বেকার মানুষ কিংবা নারী ও কিশোরদের। বিএসএফকে অবগত না করে কিংবা টাকা না দিয়ে সীমান্ড় অতিক্রম করতে গেলে তাদের গুলির শিকার হতে হয়। বাংলাদেশণ্টভারত সীমান্ড়ে হতাহতের বেশির ভাগ ঘটনাই ঘটে মধ্যরাতের পর বা ভোরে। বিএসএফের হত্যাণ্টনির্যতনের শিকার অনেকেই অবৈধভাবে ভারত থেকে পণ্য আনাণ্টনেওয়ার কাজে জড়িত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। সীমান্ড়ে হত্যার শিকার হওয়ার অন্যতম কারণ গরু চুরি বা পাচার। গৃহপালিত গরু সীমানা পেরিয়ে গেলে ফিরিয়ে আনার সময় সন্দেহভাজন হিসেবে গুলির শিকার হতে হয় মানুষকে।

ভারত সীমান্ড়ে হত্যার প্রধান কারণ হিসেবে ক্রসণ্টবর্ডার টেররিজমকে উলেণ্টখ করে থাকে। বিভিন্ন সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলার প্রভাব পড়ে সীমান্ড়ে। আসামের উলফাসহ বিচ্ছিন্নতাবাদী দল এবং পাকিস্ড়ানের আইএসআই পরিচালিত জঙ্গিদের দমন কার্যক্রমে বেশির ভাগ শিকার হয় নিরীহ জনগণ। গুলিতে নিহত অজ্ঞাত বা পরিচয়হীনরা বিএসএফের জবাবদিহির একটি বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হতে সহায়তা করে। এর পাশাপশি ভারত অবৈধ অভিবাসনকেও সীমান্তে বলপ্রয়োগের অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করে। আসামে মুসলিম জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধির কারণ হিসেবে তারা অবৈধ অভিবাসনকে চিহ্নিত করেছে।

অভিবাসন বন্ধ মনস্ড়াত্ত্বিকভাবে প্রভাবিত করতে ব্যবহৃত হয় বর্বর পন্থা। তবে কারণ যেটাই হোক না কেন, সীমান্তে অবাধে মানুষ হত্যার বৈধ অধিকার কোনো নিরাপত্তা বাহিনীরই নেই।

সীমান্তে গুলি চালানোর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ

সীমান্ড়ে বাংলাদেশিদের ওপর নির্যাতনণ্ট নিপীড়নের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের সীমান্ড়রক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে থাকে। বিএসএফ এর কাছে লিখিত ও মৌখিকভাবে হত্যাকান্ডের ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয়। এসব বিষয়ে বিভিন্ন সময় তদন্ড়ের আশ্বাস দেওয়া হলেও তার ফল জানা যায় না। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে পাঁচ দফায় সীমান্ড়ে হত্যার প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। এর পরও ২০১২ সালে ৪০ বাংলাদেশি নিহত হওয়ার ঘটনা উদ্বেগজনক বিষয়। সীমান্তে হতাহতের সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনার অঙ্গীকার বাস্ড়বায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোকে আরো গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

বাংলাদেশ বরাবরই সীমান্ড়ে গুলি চালানোর বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়ে আসছে। সীমান্ড়ে অপরাধীদের গুলি না করে তাদের প্রতিরোধ, গ্রেপ্তার বা আটক করারও অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ। ভারতের সীমান্ড়রক্ষী বাহিনী মারণাস্ত্রের বিকল্প হিসেবে প্রাণঘাতী নয় এমন অস্ত্র ব্যবহার শুরুও করেছে। এ ধরনের উদ্যোগ অবশ্যই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

ভারতের অবস্থান কী?

ভারতও মনে করে সীমান্তে হত্যা দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক। ৬ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে ভারতের হাইণ্টকমিশনার পঙ্কজ শরণ সীমান্ড় হত্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বাংলাদেশণ্টভারত যে সম্পর্ক সেখানে সীমান্ড়ে একটি হত্যা হলেও তা অনেক। একটি হত্যাই এখানে অনেক হত্যার সমান। এসব হত্যা দুর্ভাগ্যজনক ও দুঃখজনক। এ সমস্যা সমাধানে উপায় বের করতে দুপক্ষ কাজ করে চলেছে।' দুই দেশের উষ্ণ সম্পর্কের মধ্যে সীমান্ড়ে হত্যার ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করে।

উদ্যোগ সত্ত্বেও কমছে না হত্যা

সীমান্ড়ে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ২০১১ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় যৌথ সীমান্ড় ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (সিবিএমপি)। এর আওতায় সীমান্ড়ের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলো চিহ্নিত করে দুই দেশের সীমান্ড়রক্ষী বাহিনীর কাজ করার কথা

বলা হয়েছে। সীমান্তের এ পাশে বিজিবি ও অন্য পাশে বিএসএফ কাজ করে। অবৈধভাবে কেউ যাতে সীমান্ত অতিক্রম না করে তা নিশ্চিত করতে উভয় বাহিনী নিজ নিজ অংশে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করবে বলে আশা করা হয়েছে এই পরিকল্পনায়।

সীমান্ত ও হত্যা নিয়ে রাজনীতি

বাংলাদেশে যেমন ভারতবিরোধিতা নিয়ে রাজনীতি করা হয় তেমনি ভারতেও বিজেপির মতো দলগুলো বাংলাদেশবিরোধিতাকে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করে, যার পরোক্ষ প্রভাব পড়ে সীমান্তে। কিন্তু পার্থক্য হলো ভারতে জাতীয় স্বার্থে সকল দল ঐক্যবদ্ধ থাকে আর বাংলাদেশে ইস্যু খোঁজা হয় ক্ষমতা গ্রহণের সিঁড়ি হিসেবে। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী প্রায় সকল এলাকার জনপ্রতিনিধিদের বড় একটি অংশ চোরাচালানিদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। চোরাচালান বন্ধে সীমান্তবর্তী বাহিনী ছাড়াও বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম এই জনপ্রতিনিধিগণ। অথচ, সহজসরল জনগণের অনুভূতিকে ব্যবহার করা হয় রাজনৈতিক স্বার্থে। ভোটের জন্য জীবনের চেয়ে ইস্যুই যেন বড় হয়ে দাঁড়ায়।

সীমান্তে হত্যাকাণ্ডের যতই কারণ দেখানো হোক না কেন, এটি নিঃসন্দেহে মানবতাবিরোধী একটি ঘটনা। বিএসএফ যে শুধু সীমান্তে শুধু বাংলাদেশীদেরই হত্যা করেছে এমন নয়। বিএসএফ কর্তৃক হত্যাকাণ্ডের শিকার ভারতীয়দের সংখ্যাও কম নয়। তবে কোনো বাংলাদেশিকে হত্যা করা হলেই কেবল আমরা জানতে পারি। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভারতীয় নাগরিক নিহত হওয়ার বিষয়টি তাদের সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয় না। সীমান্তে হত্যা বন্ধে সম্প্রতি ভারতে চারজন বিএসএফ সদস্যকে বরখাস্ত করাসহ সাতজনকে কারাদণ্ড দেওয়ার সংবাদ পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের একটি ইতিবাচক দিক। হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। কারণসমূহ নির্দিষ্ট করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে যে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে, তা ফলপ্রসূ হবে বলে আশা করি।

ইন্দিরা হক : সাংবাদিক।
ইমেইল: nusratru@gmail.com

সীমান্ত হাট ও সীমান্তের মানুষের অর্থনীতি

হোজ্জাতুল ইসলাম

দীর্ঘ ৫ বছর ধরে ফাইল চালাচালির পর ২০১১ সালের ২৩ জুলাই কুড়িগ্রামের বালিয়ামারীতে প্রথম যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশভারতের সীমান্ত হাট। সীমান্তের দুর্গম এলাকার অধিবাসীদের জীবনযাপন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত হাট চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সীমান্ত হাট চালুর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সেভেন সিস্টার্সের মেঘালয়সহ বিভিন্ন রাজ্যের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ বাংলাদেশি বিভিন্ন পণ্য সাশ্রয়ী দামে কেনার সুযোগ পাবে। অন্যদিকে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় মানুষ সাশ্রয়ী দামে ভারতের কৃষিপণ্য এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য ব্যবহারের সুযোগ পাবে সীমান্ত হাটের কল্যাণে।

ভারতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ৭টি রাজ্যে বাংলাদেশি পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশের ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মানুষ এসব রাজ্যের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্যের সুযোগ দাবি করছে দীর্ঘদিন ধরে। সেভেন সিস্টার্স বলে পরিচিত ওই রাজ্যগুলোও বাংলাদেশের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্যের পক্ষে। কিন্তু নয়াদিল্লির দিক থেকে সম্মতি না পাওয়ায় সরাসরি বাণিজ্যের প্রস্তাব এতোদিন হিমাগারেই ছিল। ২০০৫ সালে ভারত সীমান্তের নির্ধারিত কিছু স্থানে সীমান্ত হাট স্থাপনে বাংলাদেশকে প্রস্তাব দেয়। ২০০৭ সালে ভারতীয় হাইকমিশন এ সম্পর্কিত একটি ধারণাপত্র বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। পরবর্তীতে নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উভয়পক্ষ এ বিষয়ে একমত হয়। পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমে কুড়িগ্রামের বালিয়ামারী ও সুনামগঞ্জের লাউয়াঘরে ভারতের মেঘালয় সীমান্তে পশ্চিম গারো হিলকালাইচর ও পূর্ব গারো হিল বালাতে দুটি সীমান্ত হাট চালু করা হয়। পরবর্তীতে সীমান্ত হাটের পরিসর আরো বাড়ানো হয়। কিন্তু পর্যায়ক্রমে দেখা গেছে, সীমান্তের জীবনমানের পরিবর্তনের যে লক্ষ্য নিয়ে সীমান্ত হাটের যাত্রা, কিছু সীমাবদ্ধতাও প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রকৃতপক্ষে এই লক্ষ্যের বাস্তবায়ন ঘটছে না।

অসম ক্রেতা-বিক্রেতা

কুড়িগ্রামের রাজীবপুর উপজেলার বালিয়ামারী হাটের বাংলাদেশের বিক্রেতাদের পক্ষ থেকে অভিযোগ রয়েছে, হাটে ভারতীয় ক্রেতা দিন দিন কমে যাচ্ছে। বাড়ছে বিক্রেতা। অন্যদিকে বাংলাদেশের ক্রেতা বাড়ছে। কমে যাচ্ছে বিক্রেতা। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি হাটে উভয় দেশের ২৫ জন করে ৫০ জন বিক্রেতা এবং ৩০০ জন করে ৬০০ জন ক্রেতা আসার কথা। এক হাটে উপস্থিতির হিসাবে দেখা যায়, সুপারি, আদা, জাম্বুরা, কমলা, গোলমরিচ, জিরা, শিমলা আলু ও কসমেটিকস সামগ্রী নিয়ে ৮৮ ভারতীয় বিক্রেতা

এছাড়া নতুন করে তৈরি হচ্ছে মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম, যারা স্থানীয় উৎপাদকদের কাছ থেকে কম মূল্যে জিনিস কিনে বিক্রি করে অন্যত্র। ফলে স্থানীয় উৎপাদকদের অর্থনীতিতে কোনো ইতিবাচক প্রভাব পরে না। এসব কারণে দেড় বছর পার হয়ে গেলেও সীমান্ড় হাটের সুফল পাচ্ছে না সীমান্তের মানুষ। সীমান্ড় হাট দুই দেশের সীমান্ড় এলাকার মানুষের কল্যাণে অবদান রাখলে তা হবে এক বিরাট অর্জন।

এসেছিলেন। আর তাদের (ভারত) ক্রেতা এসেছিলেন মাত্র ২৪ জন। অন্যদিকে কচুরমুখি, আলু, আখ, তৈরি বালিশ, গামছা, গার্মেন্ট পোশাক, সাবান, অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িণ্ঢপাতিল, প্ঢাস্টিক সামগ্রী, মেলামাইন ও কসমেটিকস সামগ্রী নিয়ে বাংলাদেশি ১৪ জন বিক্রেতা হাটে গিয়েছিলেন। আর ক্রেতা গিয়েছিলেন ২৬০ জন।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ হাট শুরুর সময় ২৫ জন বিক্রেতা এবং ৮০ জনের মতো ক্রেতার তালিকা দিয়েছিল। এখন ক্রেতার তালিকা ৪৪ জনে নেমে এসেছে। এ ক্রেতাদের অর্ধেকও এখন হাটে আসছেন না। অথচ তারা বিক্রেতার সংখ্যা বাড়িয়ে হাটে পাঠাচ্ছেন। ফলে ভারতীয়রা মালপত্র কিনছেন কম, বিক্রি করছেন বেশি। অন্যদিকে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ হাট শুরুর সময় ২৫ জন বিক্রেতা এবং ৩০০ জন ক্রেতার তালিকা দিয়েছিল। এখন বিক্রেতাদের অর্ধেকও হাটে যাচ্ছেন না। আর ক্রেতার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৬৯৮ জনে।

লাভের পরিমাণ কম

কুড়িগ্রামের রাজীবপুর উপজেলার ব্যাপারীপাড়া গ্রামের মাজেদা বেগমের স্বামী আলতাফ হোসেন মারা গেছেন প্রায় ১৫ বছর আগে। তারপর থেকে সংসারের হাল ধরতে তিনি গ্রামে গ্রামে ফেরি করে শাড়িণ্ঢলুঙ্গি বিক্রির ব্যবসা শুরু করেন। সীমান্ত হাট চালুর সিদ্ধান্ত হলে তিনি বালিয়ামারী সীমান্ড় হাটে শাড়িণ্ঢলুঙ্গি বিক্রির জন্য বিক্রেতা হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। পণ্য তালিকা নিয়ে জটিলতার কারণে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের ক্রেতাদের তার শাড়িণ্ঢলুঙ্গি কিনতে না দেওয়ায় শুরুতেই হোঁচট খান। এখন তিনি তৈরি বালিশ ও গামছা হাটে বিক্রি করেন। সম্প্রতি এক হাটে বাংলাদেশি ২০০ টাকায় দুটি তৈরি বালিশ এবং ১৫০ টাকায় দুটি গামছা বিক্রি করেছেন। এই ৩৫০ টাকার পণ্য বিক্রি করে লাভ তো দূরের কথা, হাটে যাতায়াতের খরচও ওঠেনি। ফলে এ হাটকে ঘিরে তার মনে যে আশার আলো জ্বলে উঠেছিল তা ক্রমেই নিভে যাচ্ছে।

শুধু মাজেদা বেগমই নন, ওই হাটে বাংলাদেশের বিক্রেতা সুরুজ্জামান আলুণ্ঢকচুণ্ঢ রসুন ও পেঁয়াজ বিক্রি করেছেন ৪৫০ টাকার, ফরজ আলী মেলামাইনের গ্লাস ও পেণ্ঢট বিক্রি করেছেন ৩০০ টাকার, আবু সাঈদ পণ্ঢাস্টিক সামগ্রী বিক্রি করেছেন ৭০০ টাকার। স্বল্প টাকার এ বেচাকেনায় লাভ থাকে খুবই কম। যাতায়াতের টাকাও অনেক সময় ওঠে না। ফলে তারাও এখন হতাশ। অথচ ভারতীয় বিক্রেতা আজিজুল শেখের ১৫০টি জাম্বুরা, মানু সাংমার ১০ বস্ড়া সুপারি, চন্দ্র কোচের ২ মণ আদাসহ ম্যানুয়াল সাংমা, জুলিরানী কোচ, মহেশ্বর হাজং, রিংচিং সাংমা, হরিদাস কোচরা যেসব মাল হাটে এনেছিলেন, তা সব বিক্রি হয়ে গেছে। নিন্দ্রা মারাকের চা ও বিন্নি এবং পোলাওর চালের ছোট ছোট প্যাকেটের দোকান থাকে বাংলাদেশের ক্রেতায় ঠাসা।

পণ্য তালিকা নিয়ে জটিলতা

হাট শুরুর প্রথম বছরে পণ্য তালিকা নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। প্রথম দিকে ক্রোকারিজ, পণ্ঢাস্টিক সামগ্রী, কসমেটিকস, ট্রয়লেট্রিজ, অ্যালুমিনিয়াম, হাঁড়িণ্ঢপাতিল, তৈরি পোশাক, জিনস, থান কাপড়, পিস কাপড়, হোসিয়ারি সামগ্রী স্থানীয়ভাবে প্রস্ড়ুত নয়ণ্ঢ এ অজুহাতে ভারতের কাস্টমস ও বিএসএফ তাদের দেশের ক্রেতাদের হাট থেকে এগুলো কিনতে দেয়নি। শুধু উভয় দেশের ৫ কিলোমিটারের মধ্যে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী হাটে বেচাকেনা করা যাবে বলে তারা ভারতের বিক্রেতাদেরও লেবু, আদা, কলা, লটকন ও সুপারি ছাড়া অন্য পণ্য হাটে বিক্রির জন্য আনতে দেয়নি। এ অবস্থায় ২০১২ সালের জুলাই মাসে মেমোরান্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং সংশোধন করে উভয় দেশে উৎপাদিত এবং তৈরি শাকণ্ঢসবজি, ফল ও মসলা, বনজ পণ্যণ্ঢ যেমন বাঁশ, ব্যাম্বোগ্রাস, শলার ঝাড়ু (কাঠ ব্যতীত), স্থানীয় কুটির শিল্পের পণ্য যেমনণ্ঢ গামছা, লুঙ্গি ইত্যাদি, স্থানীয়ভাবে প্রস্ড়ুতকৃত ছোট ছোট গৃহস্থালি কৃষি যন্ত্রপাতি যেমনণ্ঢ দা, লাঙ্গল, কুড়াল, কোদাল, বাটালি ইত্যাদি এবং গার্মেন্ট, মেলামাইন, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য সামগ্রী, ফলের রস, টয়লেট্রিজ, কসমেটিকস, পণ্ঢাস্টিক, অ্যালুমিনিয়াম ও মেলামাইন সামগ্রী এবং ক্রোকারিজ হাটে ক্রয়ণ্ঢবিক্রয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়াও হাটের তালিকাভুক্ত একজন ব্যক্তি বা তার পরিবারের জন্য স্থানীয় মুদ্রায় ৫০ ডলারের সমান অর্থের মালামাল ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে ১০০ ডলার করা হয়েছে। এরপর থেকে পণ্য তালিকা নিয়ে জটিলতার অবসান হয়েছে। তারপরও হাট জমে উঠছে না।

তবুও প্রত্যাশা

হাটে যাওয়ার জন্য কাঁচা রাস্ড়া ও কোনো কোনো নদীতে ব্রিজ না থাকায় বাঁশের সাঁকো দিয়ে পণ্য পরিবহন সমস্যা রয়েছে। পাশাপাশি ব্যাংকের কোনো কাউন্টার না থাকায় ভারতীয় টাকা তাৎক্ষণিকভাবে বদলে নেওয়ার সমস্যায় ভুগছেন বাংলাদেশের বিক্রেতারা। এছাড়া নতুন করে তৈরি হচ্ছে মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম, যারা স্থানীয় উৎপাদকদের কাছ থেকে কম মূল্যে জিনিস কিনে বিক্রি করে অন্যত্র। ফলে স্থানীয় উৎপাদকদের অর্থনীতিতে কোনো ইতিবাচক প্রভাব পড়ে না। এসব কারণে দেড় বছর পার হয়ে গেলেও সীমান্ড় হাটের সুফল পাচ্ছে না সীমান্তের মানুষ। সীমান্ড় হাট দুই দেশের সীমান্ড় এলাকার মানুষের কল্যাণে অবদান রাখলে তা হবে এক বিরাট অর্জন। তবে দুই দেশের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য সাধনে সামঞ্জস্য রেখে এ হাটের পরিসর ও আওতা আরো বাড়ানোর কথা ভাবা যেতে পারে। এ ব্যাপারে উভয় সরকারকে উদার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

সীমান্ত হাট সম্পর্কিত কেসস্টাডির জন্য দৈনিক সমকাল-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

হোজ্জাতুল ইসলাম: মানবাধিকারকর্মী।
ইণ্ঢমইল: hozza.shomoy@gmail.com

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার অভিন্ন পরিবেশগত সমস্যাসমূহ

২০১১ সালের ৬ আগস্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনণ্টবাপা ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নিকট দুই দেশের মধ্যেকার অভিন্ন পরিবেশগত সমস্যাসমূহ সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে লিখিত আবেদন জানায়। এই আবেদনে উল্লেখকৃত সমস্যাসমূহ ও এসবের সমাধানের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

ভারত ও বাংলাদেশের রয়েছে এক অভিন্ন নৃণ্ট তাত্ত্বিক অতীত ও সামাজিকণ্টরাজনৈতিক ঐতিহ্য। তবে দুই দেশের মধ্যে বেশকিছু আন্ড়ঃসীমান্ড় নদী ও অন্যান্য প্রতিবেশ বিষয়ক সমস্যা রয়েছে যার আশু সমাধান প্রয়োজন। বিশেষ করে দুই দেশের মধ্যকার কিছু অভিন্ন নদী বিষয়ে ভারতের গৃহীত কিছু পদক্ষেপই এসবের মূল কারণ। বাংলাদেশ যদি বিপর্যস্ড় হয় তবে ভারতও যে ক্ষতিগ্রস্থ হবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। অতএব ভারত ও বাংলাদেশ উভয়ের স্বার্থেই বাংলাদেশের জলবায়ু ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুথবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। অতএব বাংলাদেশ পারিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র পক্ষ থেকে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত তালিকাভুক্ত বিষয়সমূহ বাংলাদেশ ও ভারতের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে পেশ করছি:

অভিন্ন পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ :

০১. আন্তঃসীমান্ত নদীসমূহ: বাংলাদেশের আগত ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদীর মধ্যে ৫৪টির উৎসই ভারতে। এগুলো হিমালয় পর্বতের হিমবাহ ও উজানের এলাকায় পাহাড়ি ও সমতলভূমির বৃষ্টিপাতের বিশাল জলরাশি বহন করে চলেছে। এসব নদীর ভারতীয় উজান অংশে বাঁধ, ব্যারেজ ও অন্যান্য অবরোধমূলক অবকাঠামো এখন বাংলাদেশের নদীসমূহের প্রধান সমস্যা। গঙ্গা নদীর উপর ফারাক্কা আর তিস্ড়ার উপর গাজলডোবা ব্যারেজ দুটিই এসকল নদীবিভক্তিমূলক অবকাঠামোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। তবে, এর বাইরেও আরো অনেক নদীর উপর ভারতীয় অবকাঠামো রয়েছে যার মধ্যে উলেণ্টখযোগ্য হচ্ছে দুধকুমারী, খোয়াই, সুমেশ্বরী, মণু, গোমতি, মুহুরি ও ধরলা নদী। তাছাড়াও উজান এলাকায় বন উজাড়, খনিজ অনুসন্ধান ইত্যাদির ফলে অজস্র পাথরের টুকরা, মাটি, বালু, কয়লার কাদা প্রভৃতি বাংলাদেশমুখী নদীগুলো পানিতে এসে মিশ্রিত হয়ে নদীর প্রবাহ বিঘ্ন ও দূষণ ঘটাচ্ছে। উজানের শিল্পণ্টদূষণ, আবাসন বর্জ ও গবাদিপশুর বিষ্ঠার মিশ্রণও নদীসমূহের প্রভূত দূষণ সৃষ্টি করছে। এসকল সাধারণ অনুষঙ্গের প্রেক্ষাপটে, আমরা নিম্নবর্ণিত সুনির্দিষ্ট বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

(ক) গঙ্গার উপর ফারাক্কা ব্যারেজ: বাংলাদেশের দক্ষিণণ্টপচিমাঞ্চলের নদী, খাল ও জলাশয়সমূহের উপর ফারাক্কা বাঁধের ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়েছে। বর্তমানে দেশের মৃতপ্রায় ২৫টি নদীর মধ্যে অধিকাংশই এ এলাকার। ফারাক্কা ব্যারেজের ফলে সৃষ্ট পদ্মার স্বল্প পানিপ্রবাহ উলেণ্টখিত নদীগুলোর পূনঃসঞ্জীবন পরিকল্পনা সফল না হওয়ার প্রধান কারণ। পরিহাসের বিষয় হচ্ছে, ফারাক্কা ব্যারেজ স্থাপনের জন্য ভারতের পক্ষ থেকে কলকাতা সমুদ্রবন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধির যে যুক্তি দেয়া হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ড় যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়নি। বরং তার পরিবর্তে ফারাক্কা এখন পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কতিপয় এলাকায় নিয়মিত বন্যার সৃষ্টি করছে। গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায় যে, সেখানকার ক্ষতিগ্রস্থ জনগণ হাতে হাতুড়ি নিয়ে ফারাক্কা ব্যারেজ অবিলম্বে ভেঙ্গে দেয়ার দাবীতে প্রায়ই মিছিল করে থাকেন। গঙ্গার পানিবণ্টন বিষয়ে ১৯৯৬ সনে স্বাক্ষরিত ভারতণ্ট বাংলাদেশ চুক্তি, ফারাক্কার ব্যারেজের ফলে বাংলাদেশের যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার কোনো মৌলিক সমাধান দিতে পারেনি। আসলে বাংলাদেশের দক্ষিণণ্টপচিমাঞ্চলের নদী ও প্রতিবেশের বাঁচিয়ে তোলার ক্ষেত্রে পদ্মা নদীর শীতকালীন ক্ষীণ প্রবাহ অত্যন্ড় অপ্রতুল অকার্যকর এক জলধারা।

(খ) তিস্তা নদীর উপর ভারতীয় ব্যারেজ: ভারত তিস্ড়া নদীর পানি সরিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে তার সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গীয় অংশে এই নদীর উপর বেশ কয়েকটি ব্যারেজ স্থাপন করেছে। এসকল ব্যারেজ তিস্ড়নদীর পানির পরিমাণ এতটাই হ্রাস করেছে যে, বিশেষত শীতকালে স্বল্পপ্রবাহের সময় বাংলাদেশের জন্য আদতে কোনো পানিই থাকে না। তবে গঙ্গার পানি নিয়ে ভারতণ্টবাংলাদেশের চুক্তির অভিজ্ঞতায় বলা যায়, তিস্ড়ার উপর নির্মিত সকল ভারতীয় ব্যারেজ অপসারণ করে তিস্ড়া নদীর প্রবাহ পুনরুদ্ধার না করা পর্যন্ড় উত্তরণ্টপচিমাঞ্চলীয় বাংলাদেশের নদী ও পরিবেশের কোনো প্রকার উন্নতি সাধিত হবে না।

(গ) বরাক নদীর উপর টিপাইমুখ বাঁধ: সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, ভারত বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে বরাক নদীর উপর টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের কাজে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে অনেকের মতে এই বাঁধটিও টিপাইমুখের একটু ভাটিতে তাদের সম্ভাব্য নদী বিভক্তিমূলক ফুলেরতল ব্যারেজে পরিকল্পনারই একটি অংশ হবে। সুতরাং টিপাইমুখ বাংলাদেশের মানুষের জন্য এক বড় দুঃশ্চিন্ড়ার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ তা বাংলাদেশের দুটি অত্যন্ড় গুরুত্বপূর্ণ নদী সুরমা ও কুশিয়ারা প্রবাহে মারাত্মক বিঘ্ন

ঘটাবে। সুরমা ও কুশিয়ারা নদী আবার এক হয়ে বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম নদী মেঘনার সৃষ্টি করেছে। টিপাইমুখ বাঁধ, বৃহদাকার ও পরিবেশের জন্য স্পর্শকাতর জলাশয় হাওরসহ উত্তরণ্টপূর্বাঞ্চলীয় বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। টিপাইমুখ বাঁধকে অনেকেই বাংলাদেশের জন্য 'উত্তরাঞ্চলের ফারাক্কা' বলে অভিহিত করেন। সুতরাং অনতিবিলম্বে টিপাইমূখ বাঁধ পরিকল্পনা ভারতের বাতিল করা উচিৎ।

(ঘ) ব্রহ্মপুত্র নদীতে হস্তক্ষেপ: ফারাক্কার কারণে পদ্মার পানি হ্রাস পাওয়াতে ব্রহ্মপুত্রই বাংলাদেশের পানির প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুতঃ বাংলাদেশের ভূণ্ট উপরিস্থিত জলরাশির সত্তর শতাংশই ব্রহ্মপুত্রের সূত্রে প্রাপ্ত। অতএব বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচের পানির জন্য উত্তরণ্টপূর্ব ভারতের অরুণাচল, আসাম, মেঘালয় ও মণিপুরে ব্রহ্মপুত্র নদী, তার বিভিন্ন উপনদী ও শাখানদীর উপর ভারত সরকারের কথিত ১৪৮টি বাঁধ ও ব্যারেজ নির্মাণের কথা সর্বজনবিদিত। ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় এধরনের ব্যাপক হস্ড়ক্ষেপ বাংলাদেশের উপর শুধুমাত্র একটি মহাদুর্যোগই নিশ্চিত করবে। উত্তরণ্টপূর্ব ভারতের এতসব বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা বিশেষ করে অত্র এলাকা ভূণ্টতাত্ত্বিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে অতি গুরুত্বপূর্ণ, অন্ড়তঃ বৃহৎ ভূণ্টকম্পনের ফলে বাঁধের ভাঙ্গন ও তার ফলে সর্বনাশা বিপর্যয় এক অবধারিত সম্ভাবনা। গণমাধ্যমে প্রকাশ যে, চীনের কেন্দ্রীয় ও উত্তরাঞ্চলের দিকে পানি সরিয়ে নেয়ার মানসে দেশটি তার এলাকাভুক্ত ব্রহ্মপুত্রের উপরিভাগে (যেখানে তা সাঙপু নদী নামে পরিচিত) বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। এই নদীণ্টবিভাজকচৈনিক পরিকল্পনাটি বাস্ড়বায়িত হলে ভারত ও বাংলাদেশ উভয়েরই ব্রহ্মপুত্র থেকে প্রাপ্য পানির পরিমাণ হ্রাস পাবে। ভারত ও চীন উভয়েরই আন্ড়র্জাতিক নদীসমূহের উপর সকল প্রকার পানিপ্রবাহ বিভাজক পরিকল্পনা পরিত্যাগ করা উচিৎ।

(ঙ) ভারতীয় আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প (আইআরএলপি): বাংলাদেশের মানুষ, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পানি দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের দিকে প্রেরণের উদ্দেশ্যে প্রণীত ভারতীয় আন্ড়ঞ্চনদী সংযোগ প্রকল্প বা আইআরএলপি নামক এক বিশাল নদী অবরোধমূলক প্রকল্পের খবরে আশঙ্কাগ্রস্থ হয়ে আছে। এমনকি অনেক ভারতীয় পানি বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, এ ধরনের প্রকল্প অত্র উপমহাদেশের বিদ্যমান ভৌত ভূমিচরিত্রের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, যার ফলে অত্র এলাকায় পরিবেশ দুর্যোগ নেমে আসবে এবং তা হবে বেশ সম্পদহানিকর। নিঃসন্দেহে এই প্রকল্প, বাংলাদেশের সকল প্রধান নদীর পানি সরিয়ে নেয়ার মাধ্যমে দেশটির সম্পূর্ণ টুঁটি চেপে ধরার কাজটি সম্পন্ন করবে। ভারতের উচিৎ আন্ড়ঞ্চনদী সংযোগ প্রকল্প ধারণাটি সম্পূর্ণ বাতিল করা।

(চ) আন্তঃসীমান্ত বন্যা প্রবাহ: নদী বিভাজন ছাড়াও আন্ড়ঞ্চসীমান্ড় নদীগুলোর আরো কিছু সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে: ভারতের উত্তরণ্ট পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা থেকে আগত আকস্মিক বন্যা, যার পানিতে রয়েছে বিশাল পরিমাণের বালু, পাথরের টুকরো, কয়লার কালো পানি, গুড়ামাটি ইত্যাদি এবং সেগুলো দ্বারা পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশী এলাকাকে পণ্টাবিত করছে।

বৃহত্তর সিলেট এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও কুমিলণ্টার কিছু স্থানের জন্য এটি বেশ বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই আকস্মিক বন্যার তোড়ে বয়ে আনা রাবিশ ময়লা যাদুকাটাসহ বেশ কটি নদী ভরাট করে দিচ্ছে। এসব ময়লা ও বালুর চাপে সেখানকার বিশাল এলাকার কৃষি জমি চাষাবাদের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এই ক্ষতিকর প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হলে বাংলাদেশ সীমান্ড় ঘেঁষা ভারতীয় রাজ্যসমূহের নদীর পাড় ও তাদের প্রবাহণ্টএলাকায় অপরিকল্পিত কয়লা উত্তোলন, বন উজাড় ও পাহাড় ন্যাড়াকরণ এবং অন্যান্য পরিবশে বিধ্বংসী কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

(ছ) আন্তঃসীমান্ত দূষণ: সীমান্ড় অতিক্রান্ড় নদী দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে আগত আন্ড়ঞ্চসীমান্ড় দূষণ এখন মারাত্মক সমস্যার রূপ ধারণ করেছে। আবাসন বর্জ্যের সাথে পশুর মৃতদেহ ইত্যাদির সমন্বয় চিরাচরিত ময়লার সাথে বর্তমানে যুক্ত হচ্ছে শিল্পবর্জ্য। নদীপথে বয়ে আসা দূষণ প্রক্রিয়া এখন আর গঙ্গার মতো কিছু বৃহৎ নদীতে সীমাবদ্ধ নেই বরং এটি এখন সকল নদীতেই বিস্ড়ৃত হচ্ছে। যেমনণ্ট আগরতলার ময়লা সালদা নদীতে, রামগড়ের ময়লা ফেনী নদীতে এসে যুক্ত হচ্ছে। যাদুকাটা নদী ঘেঁষা মেঘালয় থেকে আসা বর্জ্যের মতো কোনো কোনো ময়লার সাথে ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয় উপাদানও থাকছে। ভারতের পক্ষ থকে এসকল আন্তঃসীমান্ত দূষণ বন্ধ করা অতি জরুরি

এ ধরনের প্রকল্প অত্র উপমহাদেশের বিদ্যমান ভৌত ভূমিচরিত্রের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, যার ফলে অত্র এলাকায় পরিবেশ দুর্যোগ নেমে আসবে এবং তা হবে বেশ সম্পদহানিকর। নিঃসন্দেহে এই প্রকল্প, বাংলাদেশের সকল প্রধান নদীর পানি সরিয়ে নেয়ার মাধ্যমে দেশটির সম্পূর্ণ টুঁটি চেপে ধরার কাজটি সম্পন্ন করবে। ভারতের উচিৎ আন্ড়ঞ্চনদী সংযোগ প্রকল্প ধারণাটি সম্পূর্ণ বাতিল করা।

(জ) নদীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি: উপরোলেণ্টখিত বাঁধ, ব্যারেজ ও প্রকল্প সবগুলোই নদীর প্রতি 'বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি' থেকে সৃষ্ট আচার আচরণ। এই দৃষ্টিভঙ্গির মূলকথা হচ্ছে যেকোনো সমুদ্রগামী নদীর পানিই হচ্ছে 'অপচয়' অতএব নদীর সমস্ড় পানিই ব্যবহার করতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি দীর্ঘদিন যাবৎ একটি জনপ্রিয় ধারণা হিসেবেই বিদ্যমান ছিল, কারণ এটি ছিল আধুনিকতার সমার্থক। তবে সময়ের ব্যবধান ও অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, নদীর প্রতি এ ধারণাটি ছিল একটি ভুল এবং দীর্ঘ মেয়াদ ও বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে তা প্রতিবেশ, অর্থনীতি ও জনমানুষের জন্য আসলে ক্ষতিকর। এই ধারণাটি অভিন্ন নদী ব্যবহারকারী বিভিন্ন জাতি ও এলাকার মধ্যে সংঘাতের প্রধান কারণ। তাই ভারতের এই নীতি অনুসরণ করে নির্মিত বা পরিকল্পিত ফারাক্কা, গাজলডোবা, টিপাইমুখ অবকাঠামো ইত্যাদি বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে ও তার উন্নয়নের পথে বড় বাঁধা নির্মাণ ও তার উত্তরাঞ্চলে পানি সরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা চীন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়নের অতিরিক্ত কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অতএব বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ ও তার পরিবর্তে নদীর প্রতি 'প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি' অনুসরণ করা অত্যন্ড় জরুরি। 'প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি'র ধারণাটি নদী প্রবাহের গতিপথ ও পানির পরিমাণকে সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে উৎসাহিত করা হয়, আর নদীর মধ্যে কোনো প্রকার অবকাঠামো নির্মাণকাজকে নিরুৎসাহিত করা হয়। এটিতে স্বল্প পানি প্রবাহের সময় নদীর জন্য 'ন্যূনতম পরিমাণ', নিরবিচ্ছিন্ন স্রোতধারা ও নদীর মধ্যকার প্রাকৃতিক মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী তথা জীবণ্টবচিত্রের জন্য প্রয়োজনীয় জলাধারকে নিশ্চিত রাখার কথা বলা হয়। সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে সমুদ্রগামী নদীর পানিপ্রবাহকে অক্ষুণ্ন ও নিরবিচ্ছিন্ন রাখার জন্যও নদীর প্রতি প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ড় জরুরি। এই নীতিটি সীমান্ড় অতিক্রান্ড় নদীসমূহকে নদী অববাহিকার সকল জাতি ও এলাকার মধ্যকার সংঘাতের কারণ থেকে সরিয়ে নিয়ে বরং বন্ধুত্বের উৎসে পরিণত করে। উপমহাদেশের বৃহত্তম দেশ হিসেবে অত্র অঞ্চলের সকল দেশে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে নদীর প্রতি প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণের নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতেরই নেতৃত্ব প্রদান করা উচিৎ। অত্র অঞ্চলের নদী রক্ষা কর্মীগণ ঐক্যবদ্ধভাবে নদীর প্রতি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ ও প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির নীতিকে গ্রহণ করেছেন। এখন সময় এসেছে অত্র এলাকার সরকারি নেতৃবৃন্দকে নদীরক্ষা বিষয়ক এই জনদাবির যৌক্তিকতাকে নির্মোহভাবে অনুধাবন, এটিকে গ্রহণ ও নিজ নিজ দেশে তার বাস্ড়বায়নে উদ্যোগী হওয়া। আসন্ন ভারতণ্টবাংলাদেশ শীর্ষণ্টবৈঠকটি এই লক্ষ্যে একটি বৃহৎ পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করতে পারে। 'নৌণ্ট চলাচল বহির্ভূত নদীর পানি ব্যাবহার বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন' নদীর প্রতি প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় ভারত ও বাংলাদেশ এটিতে অবিলম্বে স্বাক্ষর করে অন্যান্য দেশকেও এটি গ্রহণে উৎসাহিত করা উচিৎ।

০২. বন ও সুন্দরবন :

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে শুধু অভিন্ন নদীই রয়েছে তা নয়। এই দুটি দেশের মধ্যে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর সম্পদ রয়েছে, যেমনণ্ট সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বন, বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ড়ের পাহাড়ি বন। এ সকল বন বেশ জীব বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ও এতে অনেক জাতিগত সংখ্যালঘু বসবাস করে। এ সকল প্রতিবেশের সম্পদ সংরক্ষণ ও প্রতিপালন করা এবং এখানে

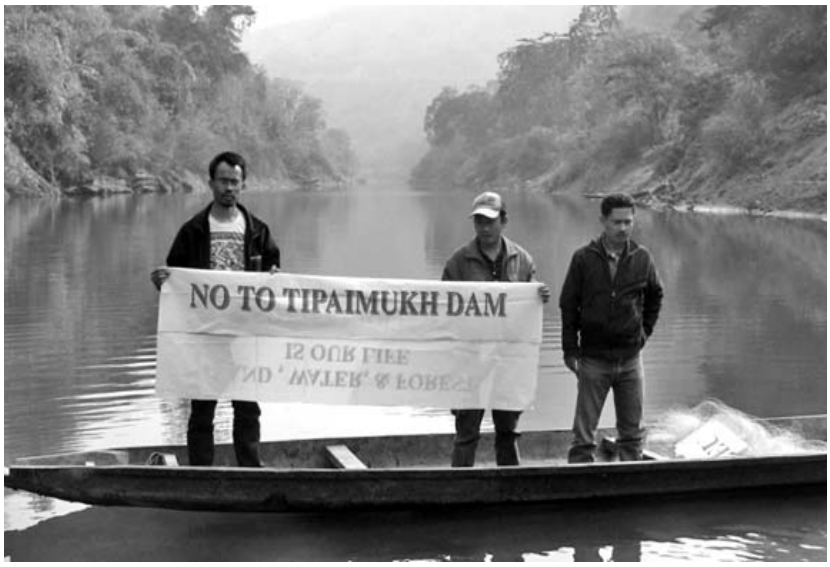

ঐতিহ্যগতভাবে বসবাসকারী সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ দায়িত্ব। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এতদবিষয়ে উলেণ্টখযোগ্য কোনো সহযোগিতামূলক কার্যক্রম পরিলক্ষিত হচ্ছে না। অথচ সম্ভাব্য জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতার প্রেক্ষাপটে বর্তমান সময়ের জন্য এ ধরনের সহযোগিতামূলক প্রয়াস অত্যন্ড় গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশণ্টভারত শীর্ষ বৈঠকে আমাদের অভিন্ন ম্যানগ্রোভ বন ও পাহাড়ি বন সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতামূলক প্রক্রিয়ায় অর্থবহ অগ্রগতি সাধন করা যেতে পারে। বাংলাদেশ ও ভারত তাদের প্রাকৃতিক বনে বিদেশি প্রজাতি প্রবেশ বা সাযুজ্যবিহীন গাছের প্রবেশ প্রতিরোধে যৌথ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। এতদ্বিষয়ে ভারতণ্ট বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে খুলনার রামপালে ১৩২০ মেগা ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনায়ও বাপা এখন শঙ্কা অনুভব করছে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উদ্‌গারিত বিভিন্ন প্রকার গ্যাসীয় ও অন্যান্য বর্জ্য প্রস্ড়বিত স্থান থেকে মাত্র সাত মাইল দূরে অবস্থিত সুন্দরবনের সমূহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অতএব বাপা বাংলাদেশ সরকারের নিকট এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বর্তমান স্থানটির বদলে অধিকতর নিরাপদ অন্য একটি স্থানে সরিয়ে নেয়ার অনুরোধ জানাচ্ছে। বাপা আশা করছে, ভারত ও এই স্থান বদলের যৌক্তিকতাকে অনুধাবন করবে।

০৩. সমুদ্রসীমা ও সামুদ্রিক সম্পদরাজি :

প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কিছু সীমান্ত সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে এবং তা সমুদ্রসীমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই বঙ্গোপসাগরে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আন্ড়র্জাতিক সমুদ্র সীমানা বিষয়ে কিছু ভিন্ন মতও রয়েছে। সুতরাং নিজস্ব আইনী সীমানার মধ্যে জ্বালানি, মৎস্য ও অন্যান্য সম্পদ আহরণের স্বার্থে বাংলাদেশ ও ভারত উভয়েই তাদের সমুদ্র সীমানার বিরোধ বিদ্যমান আন্ড়র্জাতিক রীতিনীতি, ঘোষণা, প্রস্ড়াব ও আইনাবলী এবং পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে মিটিয়ে ফেলতে পারে। জাতিসংঘ নির্ধারিত এ সংক্রান্ড় 'ইউএন ক্লজণ্ট০৩ নীতিমালার ভিত্তিতেই এই সমুদ্র সীমান্ড় বিরোধ মীমাংসিত হওয়া উচিৎ যাতে বলা হয়েছে, যেকোনো সমুদ্রের তলার মালিক হবে সেই পার্শ্ববর্তী দেশ যার মধ্যদিয়ে বয়ে আসা পলিমাটি দিয়েই এ সমুদ্র তলের সৃষ্টি হয়েছে।

০৪. জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কৌশল :

বাংলাদেশ ও ভারতসহ সমগ্র বিশ্বসম্প্রদায়ের জন্যই জলবায়ু পরিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের ভূমির স্বল্প উচ্চতা, জনঘনত্ব, ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকটের অন্যতম প্রধান দেশ বলে পরিগনিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে ভারত জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী গ্রীন হাউস গ্যাসণ্টএর অন্যতম 'সর্বাধিক উৎপাদক' দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সুতরাং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদ মোকাবিলায় বাংলাদেশের জন্য ভারতীয় সহায়তা প্রয়োজন। প্রথমত: জলবায়ু পরিবর্তন বৃদ্ধি ঠেকানোর জন্য ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গ্রীন হাউজ গ্যাস উৎপাদন হ্রাসে শক্তিশালী নেতৃত্বের ভূমিকা

পালন করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ভারত প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা ন্যূনতম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পন্থা যার মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশকে সাহায্য করতে পারে, তা হচ্ছেঃ অভিন্ন নদীসমূহের উপর তাদের নির্মিত সকল বাঁধ ও ব্যারেজ খুলে দেয়া, যাতে নদীগুলোর মুক্ত পানি প্রবাহ পুনস্থাপিত হয়। নদীর পূর্ণ প্রবাহ ও তার সাথে বয়ে আনা পলিমাটি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনের সমুদ্র স্ফীতি ও জমির লবণাক্ততা রোধে সহায়ক হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট সাংবাৎসরিক নদী প্রবাহে ভারসাম্যহীনতাকে নিয়ন্ত্রণে মুক্ত নদীগুলো সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সুন্দরবন রক্ষায় দুই দেশের সহযোগিতা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চরম আবহাওয়া মাত্রা ও সংখ্যা হ্রাসে সহায়ক হবে। ভারত ও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও প্রতিরোধ এ রকম আরো অনেক কিছুই করণীয় বিষয় রয়েছে। তারা বাংলাদেশে একটি 'জাতিসংঘ জলবায়ু কেন্দ্র' স্থাপনের দাবি জানাতে পারে। বাংলাদেশ ও ভারত শীর্ষ বৈঠকেই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় যৌথ ও সহযোগিতামূলক কর্মসূচি গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

০৫. রেলপথ ও রেল পরিবহনে সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ :

ভারতণ্ঢবাংলাদেশ আলোচনা দুই দেশের অভ্যন্ড়রের ও আন্ড়ঃরাষ্ট্রীয় রেল যোগাযোগ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। বিশেষ করে বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম রেলপদ্ধতির কাছ থেকে দক্ষ রেল চলাচল, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নণ্ঢঅভিজ্ঞতায় অনেকভাবে উপকৃত হতে পারে। বাংলাদেশের গণমুখী ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়নকর্মে অতীতে তার রেলপথ নিয়ামক ভূমিকা পালন করলেও, বিগত কয়েক দশকে রেল যোগাযোগকে যথেষ্টই অবহেলার শিকার হতে হয়েছে। আমরা আশা করি যে, বাংলাদেশ তার রেলপথ ও তার পরিবহনে একটি পুনঃজাগরণ ও উন্নতি সাধনে ভারতীয় সহযোগিতা লাভের প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

পরস্পরের জন্য সুবিধাজনক প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ ও ভারত তাদের মধ্যকার ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট বিষয়সমূহের সমাধান করে নেওয়া উচিৎ। বিশেষ করে, যথাযথ আর্থিক ফি ও প্রাপ্যতা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার অতিরিক্ত হিসাবে বাংলাদেশ সঙ্গতভাবেই 'বিনিময়ভিত্তিক প্রত্যর্পন' নীতিতে ভারতকে ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা প্রদানের শর্ত হিসাবে অভিন্ন নদীসমূহের উপর নির্মিত, পানি প্রবাহ বিভাজনকারী ভারতীয় অবকাঠামোসমূহের অপসারণ দাবি করতে পারে। বাংলাদেশের মানুষ এ রকম একটি সমাধান প্রক্রিয়াকে অত্যন্ড় ইতিবাচক হিসাবে গ্রহণ করবে এবং ভারতকে এসব সুবিধা প্রদানের ফলে দেশের মধ্যে সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াও প্রশমিত থাকবে। তবে বাংলাদেশকে তার নিজস্ব প্রয়োজনে একটি বিস্তৃত 'ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা' প্রণয়ণ ও তার প্রেক্ষাপটে ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্টকে বিবেচনা করতে হবে।

০৬. তথ্য বিনিময় :

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি প্রশমন ও সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে তথ্য বিষয়ে খোলামেলা অবস্থান। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে, ভারত অভিন্ন অনেক নদীর উপর তার স্থাপিত বা পরিকল্পিত অবকাঠামো বিষয়ে তথ্য প্রদানে অনাগ্রহী। সাম্প্রতিক উদাহরণ হচ্ছে আন্ড়ঃনদী সংযোগ প্রকল্প ও টিপাইমুখ বাঁধ। এসব বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তি বাংলাদেশের মানুষের জন্য বেশ কষ্টকর বিষয়।

সুণ্ঢভবিষ্যৎ ও সর্বণ্ঢউপযোগী পরিবেশের স্বার্থে উভয় দেশই অভিন্ন পরিবেশ সংক্রান্ড় সকল তথ্যের ভাগাভাগি নীতি গ্রহণ করতে পারে। বিশেষ করে বাংলাদেশ এবং ভারত বন্যা ও নদী প্রবাহ, ঘূর্ণিঝড়, দুই দেশের মধ্যকার অভিন্ন বনের উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির আন্ড়ঃসীমান্ড় আদানণ্ঢপ্রদান প্রভৃতি বিষয়ে যথাসময়ে যথোপযুক্ত তথ্য ভাগাভাগি হতে পারে। এ দুটি দেশ পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি অভিন্ন পরিবেশগত লক্ষ্যও নির্ধারণ করতে পারে।

০৭. সার্ক পরিবেশ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শক্তিশালীকরণ :

বাংলাদেশ ও ভারত, অত্র এলাকার জলবায়ু পরিবর্তন ও অন্যান্য অভিন্ন পরিবেশ সংশিণ্ঢষ্ট বিষয়ে একটি আঞ্চলিক সার্ক পরিকল্পনা প্রণয়নে যৌথ প্রয়াস গ্রহণ করতে পারে।

উপসংহার :

দুই প্রতিবেশী দেশের পরিবেশ ও মানুষ রক্ষার জন্য উলিণ্ঢখিত বিষয়সমূহ অর্জন বা বাস্ড়বায়নে বাপা বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধামন্ত্রীদ্বয়কে অনুরোধ জানাচ্ছে।

সুন্দরবন রক্ষায় দুই দেশের সহযোগিতা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চরম আবহাওয়া মাত্রা ও সংখ্যা হ্রাসে সহায়ক হবে। ভারত ও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও প্রতিরোধ এ রকম আরো অনেক কিছুই করণীয় বিষয় রয়েছে। তারা বাংলাদেশে একটি 'জাতিসংঘ জলবায়ু কেন্দ্র' স্থাপনের দাবি জানাতে পারে। বাংলাদেশ ও ভারত শীর্ষ বৈঠকেই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় যৌথ ও সহযোগিতামূলক কর্মসূচি গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

বিশেষত বাপা আশাবাদী যে, বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করে নদীর প্রতি প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ, গাজলডোবা, ফারাক্কা ও অন্যান্য অবকাঠামো অপসারণের মাধ্যমে সকল সীমান্ড় অতিক্রান্ড় নদী প্রবাহের পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে। বাংলাদেশকে অবশ্যই যথোপযুক্ত ফি ও নিরাপত্তাসহ ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট এর পরিবর্তে ভারতের নিকট সকল সীমান্ড় অতিক্রান্ড় নদীর পূর্ণ পানি প্রবাহ দাবি করতে হবে। সর্বোপরি বাপা আশা করছে যে, দুই দেশের মধ্যে জলবায়ু পবির্তনের সংকট মোকাবিলায় একটি সহযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হবে।

এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য বাপা'র সাধারণ সম্পাদক জনাব ডা. আব্দুল মতিনের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
ই-মেইল: সবসড়ু১৪@ধমহর.পড়স

মানবাধিকার পরিস্থিতি ২০১২

মাজহারুল ইসলাম

কেসণ্ঢ১

১২ সেপ্টেম্বর ২০১২ কুষ্টিয়ার খোকসা থানার আমবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের বাড়ইপাড়া গ্রামের মোঃ শামছুদ্দিন মোলণ্ঢ্যা ও মোছাঃ তারা খাতুনের ছেলে মোঃ আতিয়ার রহমান ওরফে তোফা মোলণ্ঢ্যাকে (৩০) র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) সদস্যরা গুলি করে হত্যা করে বলে অভিযোগ রয়েছে। আতিয়ার তার স্ত্রী ও সন্ড়ানদের নিয়ে পাবনার আতাইকুলা থানার আতাইকুলা মহলণ্ঢার শফি শেখের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। তার স্ত্রী শ্যামলী খাতুন জানান, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৮টায় ৫ জন লোক র‍্যাব সদস্য পরিচয় দিয়ে তাদের বাসায় ঢুকে এবং তারা আতিয়ারের সঙ্গে কথা বলবে বলে জানায়। আতিয়ার তখন রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। র‍্যাব সদস্যরা ঘরে ঢুকে আতিয়ারের কোমরের লুঙ্গি চেপে ধরে টেনে হিচঁড়ে ঘর থেকে বের করে। তিনি জানতে চান, তার স্বামীকে কেন নেয়া হচ্ছে? একজন র‍্যাব সদস্য তখন বলে, আতিয়ারের সঙ্গে তাদের কথা আছে। একথা বলেই আতিয়ারকে ধরে বাড়ির বাইরে নিয়ে যায়। ১২ সেপ্টেম্বর ২০১২ ভোর রাত আনুমানিক ৫টায় আতিয়ারকে কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানার পদ্মা নদীর মাঝে অবস্থিত চরসাদিপুর এর কাশবনে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। লাশের বুকে তিনটি গুলি লেগেছে। দুইটি গুলি পেছন দিক দিয়ে বের হলেও একটি গুলি বের হয়নি। রাত আনুমানিক ৮টায় পারিবারিক কবরস্থানে তার স্বামীর লাশ দাফন করা হয়।

কেসণ্ঢ২

কুষ্টিয়ার এক কলেজছাত্রী ও তার মাকে ৯ দিন থানায় আটকে রেখে চরম নির্যাতন করেছে পুলিশ। চরমপন্থি কানেকশনের অভিযোগে তাদের থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। খোকসা থানা ও ডিবি অফিসে আটকে রেখে কলেজছাত্রীর ওপর দৈহিক নির্যাতন চালিয়েছে পুলিশ। ৯দিন পর ১৮ সেপ্টেম্বর ৫৪ ধারায় সন্দেহভাজন হিসেবে মা ও মেয়েকে আদালতে পাঠানো হয়। এদিকে নির্যাতনের পর মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছে ওই কলেজছাত্রী। কয়েকবার আত্মহত্যারও চেষ্টা চালিয়েছে সে। চরমপন্থি যোগসূত্রের অভিযোগে ৯ সেপ্টেম্বর রাত আড়াইটার দিকে রাজবাড়ির বেড়াডাঙ্গা এলাকার বাড়ী থেকে রাজবাড়ী আবুল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের এইচএসসির ওই ছাত্রী ও তার মা আলেয়া বেগম আলোকে পুলিশ আটক করে। আটককালে কুষ্টিয়ার খোকসা, কুমারখালী থানা ও ডিবি পুলিশের ১০ থেকে ১৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিল। ওই রাতে তাদের খোকসা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আলেয়া বেগম বলেন, আটকের পর খোকসা থানায় দু'দিন রাখা হয় তাদের। সেখানে রাতে কয়েক দফায় কারেন্ট শক দেয় পুলিশ। এতে তার ও তার মেয়ের হাত পুড়ে যায়। দুইদিন পর রাতে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনের ডিবি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের। এখানে ঘুটঘুটে ছোট অন্ধকার রুমে আটকে রেখে অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়েছে তার কলেজ পড়ুয়া মেয়ের ওপর। রাতের বেলা ওই ঘর থেকে তার কাছে থাকা তার মেয়েকে তিন দিন নিয়ে গেছে পুলিশ। ৩ ঘণ্টা থেকে ৫ ঘণ্টা রেখে মেয়েকে তার কাছে নিয়ে আসা হতো। এ সময় মেয়ের শরীরের পোশাক পর্যন্ড় ছিড়ে ফেলে তারা। বিধ্বস্ড় ও অসুস্থ্য হয়ে ওই রুমের মধ্যে তিন দিন আত্মহত্যার চেষ্টা চালায় তার মেয়ে। তিনি জানান, তার মেয়ের ওপর যে নির্যাতন হয়েছে, তা কোনো মা সহ্য করতে পারে না। ওর সব শেষ হয়ে গেছে। ডিবির এএসআই মাসুদসহ আরও কয়েকজন পুলিশ সদস্য তার মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যেত বলে অভিযোগ করেন তিনি। তিনি বলেন, এখন এসব কথা কাউকে না বলার জন্য পুলিশ হুমকি দিচ্ছে। বলছে, ঘটনা প্রকাশ হলে আমাদের গুম করে ফেলবে। ৯দিন আটক রাখার পর তেমন কোনো অভিযোগ না পাওয়ায় ৫৪ ধারায় আদালতে পাঠানো হয় মা ও মেয়েকে। পরের দিন জামিনে ছাড়া পান তারা। ৯ তারিখে আটক করা হলেও কুষ্টিয়া পুলিশ আদালতে চালান দেয়ার আগে ১৭ সেপ্টেম্বর তাদের গ্রেফতার দেখিয়েছে।

প্রথম ঘটনাটি বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা অধিকারণ্ঢএর কেস স্টাডি এবং দ্বিতীয় ঘটনাটি ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ দৈনিক মানবজমিনণ্ঢএ প্রকাশিত খবর। এ দুটি ঘটনার কোনোটিই কোনো মৃত্যু উপত্যকার উপাখ্যান নয়। এগুলো একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিনিধিত্ব করছে। অথচ আমাদের দেশের সংবিধান মানবাধিকারের ঝান্ডা তুলে ধরে ঘোষণা করছে 'আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ ও যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে' (অনুচ্ছেদ ৩১), এবং বলছে 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে' (অনুচ্ছেদ ১১)। তাছাড়া বাংলাদেশ মানবাধিকার সংক্রান্ড় প্রায় সকল আন্ড়র্জাতিক দলিলে অনুসাক্ষর করেছে। মানবাধিকারের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো, বেঁচে থাকার অধিকার, আর সে অধিকার রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে। কিন্তু দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে আমরা এর উল্টো চিত্রই দেখতে পাই। বরং

কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিজেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যদিও পত্রপত্রিকা কিংবা গণমাধ্যমে প্রকাশিত এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের প্রকাশিত তথ্যের থেকেও দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিস্থিতির মাত্রা ও ব্যাপকতা অনেক বেশি।

তবে ২০১২ সালে মানবাধিকার রক্ষায় বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ লক্ষ করা গেছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো মানব পাচার আইন ২০১২, পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিল ২০১২ প্রণয়ন। উচ্চ আদালত থেকে রায় দেয়া হয়েছে, রাষ্টপতি ও সরকার কর্তৃক অপরাধীদের ক্ষমা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করার এখতিয়ার আদালতের রয়েছে। এছাড়া ২০০৯ সালে সংঘটিত রাজধানীর পিলখানা হত্যাকান্ডের বিচার সম্পন্ন হয়েছে। যদিও এ বিচারের নিরপেক্ষতা ও বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে দেশি ও বিদেশি মানবাধিকার সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযুক্ত প্রধান আসামীদের অধিকাংশ গ্রেফতার হয়েছেন এবং তাদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবার ২৪ ফেব্রুয়ারি সন্ত্রাস দমন আইন ২০০৯-এর সংশোধনী বিল ২০১২ জাতীয় সংসদে পাশ হয় যেখানে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে মৃত্যুদন্ড। এ আইনে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে এতোই ব্যাপক ও অস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যার ফলে এটির অপব্যবহার ও এর মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের যথেষ্ট সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মন্তব্য করেছেন।

উল্টোদিকে দেখা যাচ্ছে, মানবাধিকার তথা আইনের শাসন নিয়ে জনমনে বেশ শঙ্কা রয়েছে। গত ৩ বছরের মতো এবারও ওআরজি কোয়েস্ট দেশব্যাপি ৫ হাজার মানুষের মতামত নিয়ে একটি জরিপ পরিচালনা করে। জরিপে দেখা যায়, দেশের ৩১ শতাংশ মানুষ মনে করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দেশের এসব ঘটনার সাথে জড়িত। সরকার মানবতাবিরোধী অপরাধের যথাযথ বিচার করতে পারবে বলে ২০০৯ সালে মনে করতো ৮৬ ভাগ মানুষ, ২০১২ সালে এটা কমে দাঁড়িয়েছে ৪৪ শতাংশে। ২০১০ সালে এই সংখ্যা ছিল ৫৭ শতাংশ ও ২০১১ সালে ৪৭ শতাংশ। বিচার ব্যবস্থার অবনতি হয়েছে বলে মনে করে ৪০ শতাংশ মানুষ (২০০৯ সালে ১৬ শতাংশ, ২০১০ সালে ২৮ শতাংশ এবং ২০১১ সালে ৩৮ শতাংশ)। যেখানে ২০১১,

ফলে দেখা গেছে এনজিওরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে সভা-সমিতি, সেমিনার ও মানববন্ধন পালন করতে পারলেও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির ৩০ সেপ্টেম্বর জ্বালানি মন্ত্রণালয় ঘেরাও কর্মসূচিতে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষকদের সমাবেশে ও পোশাক কারখানার শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ লাঠিপেটা করেছে। এ ধরনের ঘটনায় সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের যেকোনো নাগরিকের শান্ড়িপূর্ণ সভা সমাবেশ করার যে অধিকার, সেটি লঙ্ঘন করা হয়েছে।

২০১০ ও ২০০৯ সালে যথাক্রমে ৪২, ৪৮, ৫২ শতাংশ মানুষ মনে করতো বিচার বিভাগের উন্নতি হয়েছে যা ২০১২ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৩৯ শতাংশে। ধর্মভিত্তিক দলগুলোকে রাজনীতি করতে দেওয়া উচিত বলে মনে করে ৪১ শতাংশ (২০১০ ও ২০১১ ছিল ৫৯ শতাংশ)। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিপক্ষে মত দিয়েছে ৫৮ শতাংশ অংশগ্রহণকারী (২০১০ ও ২০১১ ছিল ৪০ শতাংশ)। বর্তমান সরকারের আমলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে বলে মনে করে ৩৯ শতাংশ আর অবনতি হয়েছে মনে করে ৩৮ শতাংশ অংশগ্রহণকারী। বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে মত দিয়েছে ৮৪ শতাংশ (২০১১, ২০১০, ২০০৯ সালে ছিল যথাক্রমে ৮৬, ৭৮ ও ৭৭ শতাংশ)। উপরের এই জনমতের চিত্রে এটাই প্রতিফলিত হয় যে, জনমনে আইনের শাসন নিয়ে শঙ্কা দিন দিন বৃদ্ধিই পাচ্ছে।

রাজনৈতিক সহিংসতা বাংলাদেশে নতুন কিছু নয়। সরকারি ও বিরোধী- উভয় দলেরই রাজনৈতিক সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় মাত্রায় অভাব রয়েছে। বিরোধী দলের যেকোনো কর্মকান্ডে সরকারি দল যেমন নাশকতা ও দেশবিরোধী এবং জননিরাপত্তা বিঘ্নের গন্ধ খুঁজে পায়, তেমনি বিরোধী দলও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে তাৎক্ষণিক ফল পাওয়া ও যেন তেন প্রকারে 'খবর' হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় লিপ্ত থেকেছে। এ কারণেই তারা সুযোগ পেলেই গাড়ি ভাংচুর ও পোড়ানোতে ব্যস্ড় থেকেছে। বিরোধী দলের কাজে বাধা দানে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে ১৬৫ বার। মোট ৩ হাজার ৪২৭টি খুনের ঘটনায় মধ্যে ছিল ১৯৭টি রাজনৈতিক হত্যাকান্ড। আর রাজনৈতিক কারণে আহত হয়েছেন প্রায় সাড়ে ১০ হাজার মানুষ। আবার এমনও দেখা গেছে হরতালের দিন সারা দেশে বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের ধরপাকড়ের পাশাপাশি বিএনপি অফিস এমনভাবে ঘেরাও করে রাখা হয়েছে যাতে তারা কর্মসূচি সম্পাদন না করতে পারে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে বাধা প্রদানের সংস্কৃতি। ফলে দেখা গেছে এনজিওরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে সভা-সমিতি, সেমিনার ও মানববন্ধন পালন করতে পারলেও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির ৩০ সেপ্টেম্বর জ্বালানি মন্ত্রণালয় ঘেরাও কর্মসূচিতে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষকদের সমাবেশে ও পোশাক কারখানার শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ লাঠিপেটা করেছে। এ ধরনের ঘটনায় সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের যেকোনো নাগরিকের শান্ড়িপূর্ণ সভা সমাবেশ করার যে অধিকার, সেটি লঙ্ঘন করা হয়েছে।

২০১২ সালে গুম, গুপ্ত হত্যা, অপহরণ ও নিখোঁজ হওয়ার নতুন মানবাধিকার লঙ্ঘনের সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, এ বছরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক/ হেফাজতে/ ক্রসফায়ারে অন্ড়ত ৯১ জন মারা গেছে। অধিকার-এর তথ্য অনুযায়ী বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন ৭০ জন যার মধ্যে ৫৩ জন ক্রসফায়ার, ৭ জন নির্যাতনে, ৮ জন গুলিতে এবং ২ জনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমানের মতে, বিচারবহির্ভূত হত্যার ক্ষেত্রে এখন কৌশল পাল্টানো হচ্ছে। আগে ক্রসফায়ারের বদলে এখন গুম হচ্ছে। গুম হলে কোনো হদিস পাওয়া যায় না, এমনকি পরিবার লাশের খবরও পায় না। পুলিশের ইউনিফরম ছাড়া গ্রেফতার অভিযান বন্ধের বিরোধিতা করেছেন

মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান। তিনি মনে করেন, আগে অপরাধীদের ধরে ডিটেনশন দেওয়া হতো আর এখন একেবারে পরপারে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে অভিযোগের আঙুল সবসময় র‍্যাবের দিকে। 'ক্রসফায়ার' এখন আমাদের দেশে একটি পরিচিত শব্দ। এমন কি এখন এ শব্দটি দিয়ে শিশুদের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়ানোতে ব্যবহার হয় কোনো কোনো এলাকায়। মহাজোট সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ভঙ্গ করে দেশে ক্রসফায়ার তথা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে। বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় আওয়ামী লীগ ক্রসফায়ারের কঠোর বিরোধিতা করেছিল। র‍্যাবের হাতে পা হারানো ঝালকাঠির লিমন সরকারের জন্য এক চরম অস্বস্থির কারণ। এ বছরেও তাকে হয়রানি ও মিথ্যা মামলা মোকাবেলা করতে হয়েছে।

২০১২ সালে নারীর প্রতি সহিংসতা চরম আকার ধারণ করে। অধিকার-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০১২ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৮০৫ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এদের মধ্যে ২৯৯ জন নারী, ৪৭৩ জন মেয়ে শিশু এবং ৩৩ জনের বয়স জানা যায়নি। ওই ২৯৯ জন নারীর মধ্যে ৩১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ১০১ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ৪৭৩ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৩৯ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ৮৪ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এই সময়কালে ১০ জন শিশু আত্মহত্যা করেছেন। উল্লিখিত ৮০৫ জন ধর্ষণের শিকার নারী ও শিশুর মধ্যে ১৩ জন নারী ও শিশু আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। আবার মোট ৪৭৯ জন নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এদের মধ্যে ১৮ জন আত্মহত্যা করেছেন, ৩ জন নিহত, ২৪ জন আহত, ১৫ জন লাঞ্ছিত হয়েছেন, ৯ জন অপহরণের শিকার, ৬৯ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে ও ৩৪১ জন বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে বা তাদের পরিবারের সদস্যদের আক্রমণে ৭ জন পুরুষ নিহত, ৭৪ জন আহত ও ৪৬ জন লাঞ্ছিত হয়েছেন এবং ১৪ জন নারী আহত ও ৫ জন নারী লাঞ্ছিত হয়েছেন। এ বছর ৮২২ জন বিবাহিত নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এই সময়কালে ১৪ জন বিবাহিত নারী যৌতুকের কারণে আত্মহত্যা করেছেন। এছাড়া যৌতুক

সহিংসতার প্রতিবাদ করতে গিয়ে একজন পুরুষ নিহত ও ১০ জন পুরুষ আহত হন এবং যৌতুকের কলহের কারণে ৩ জন শিশুকে হত্যা করা হয়েছে ও ২ জনকে আহত করা হয়েছে আর ১০৫ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এসিডদগ্ধদের মধ্যে ৫৮ জন নারী, ১৭ জন পুরুষ, ২০ জন বালিকা এবং ১০ জন বালক।

নিজেদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও সরকার আদিবাসীদের অস্তিত্ব অস্বীকার করছে। পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালি, সেনা সদস্য ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক আদিবাসীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে যার মধ্যে অন্যতম হলো হত্যা, নির্যাতন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানে বাধাদান, নারী ও শিশুর ওপর যৌন সহিংসতা, ভূমি দখল ইত্যাদি। রাঙামাটির ২২ সেপ্টেম্বর বাঙালি-পাহাড়ি সংঘর্ষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিশ্ব আদিবাসী দিবসে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত বিজ্ঞপ্তির ফলে আদিবাসীদের শোভাযাত্রা, সভা ও অনুষ্ঠান পালনে সরকারি নিষেধাজ্ঞার অভিযোগ রয়েছে। কক্সবাজারের রামু ও উখিয়া এবং চট্টগ্রামের পটিয়ায় ২৯ সেপ্টেম্বর রাত থেকে পর পর তিন দিন হামলা চালিয়ে বৌদ্ধ মন্দির ও তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়। এখানে হিন্দুদের মন্দির ও বাড়িঘরও ভাঙচুরের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সামনে ঘটে যাওয়া এ ঘটনায় সরকারি ও বিরোধীদলের নেতাকর্মীরা যৌথভাবে সহিংসতায় অংশগ্রহণ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আবার চট্টগ্রামের হাটহাজারি ও পাথরঘাটায় সাম্প্রদায়িক উস্কানি ছড়িয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে আক্রমণ চালিয়ে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত করা হয়েছে। একইভাবে ২৬ মার্চ এক মঞ্চনাটককে কেন্দ্র করে সাতক্ষীরার কালিগঞ্জে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে হিন্দু পরিবারের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে। জুলাইয়ে বাগেরহাটের ফকিরহাটে, আগস্টে দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে সাম্প্রদায়িক আক্রমণে নিঃস্ব করা হয়েছে হিন্দু অনেক পরিবারকে। ৭ নভেম্বর রংপুরের তারাগঞ্জের কিসমতমিনা নগরে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর হামলা করা হয়েছে। উপরের দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাচ্ছে, দেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জনগণ বহুমাত্রিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে যেখানে রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। অথচ এ ব্যাপারে আমাদের সংবিধান বলছে, 'আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে' (৪১ ক)।

দেশে বহু প্রতীক্ষিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়েছে। মানবাধিকার কমিশনের যাত্রা শুরু হয়েছে ২০০৮ সাল থেকে। কেবল কমিশনের চেয়ারম্যানের সরব উপস্থিতি গণমাধ্যমে প্রবলভাবে উপস্থিত। একটি কার্যকর মানবাধিকার কমিশনের জন্য যে লোকবল ও আর্থিক বুনিয়াদ থাকার দরকার তার কোনোটিই নেই এ সংস্থার। মানবাধিকার কমিশন ২০১১ ও ২০১২ সালে মাত্র ৮টি মানবাধিকার ঘটনার অনুসন্ধান করেছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠানসমূকে শক্তিশালী ও কার্যকর না করতে পারলে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করানো যাবে না কখনোই।

মানবাধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগের একটি শক্তিশালী ভূমিকা রয়েছে। আমাদের দেশে বিচার বিভাগের সরকারের প্রতি অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতার কারণে বিচার বিভাগের প্রতি

এভাবে অপরাধের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা রাজনৈতিক বিবেচনায় ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ায় এবং 'হয়রানিমূলক মামলার' নামে ক্ষমতাসীন দলের নেতাণ্টকর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভিন্ন গুরুতর মামলা প্রত্যাহার হওয়ায় বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষ আস্থা হারাতে থাকবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাদের পরিবারগুলো দ্বিতীয়বার ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

জনগণের আস্থাহীনতার পরিমাণ বাড়ছে। রাজনৈতিক আনুগত্য ও নির্বাহী বিভাগের ওপর নির্ভরশীলতা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্রের দুর্বলতার কারণে খুনের বিচার হয় নাণ্ট এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে মানুষের মনে। অধিকারণ্টএর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিচার বিভাগকে তোয়াক্কা না করে সরকার ২০১২ সালে খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও অবৈধ অস্ত্র রাখার মতো অনেকগুলো মামলা 'রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা' হিসেবে চিহ্নিত করে সেগুলো প্রত্যাহার করেছে। যেসব মামলা রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে প্রত্যাহারের জন্য বিবেচনায় রাখা হয়েছে, তার প্রায় সবগুলোই ক্ষমতাসীন দলের নেতাণ্ট কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ আইন প্রতিমন্ত্রী কামরুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন জাতীয় কমিটির ৩০তম সভায় খুন, ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানীর ১০টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়। এরপর ১৭ অক্টোবর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা থেকে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের এসব মামলা ও মামলা থেকে আসামীদের নাম প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়। এই ১০টি মামলাসহ বর্তমান সরকারের আমলে মোট সাত হাজার ১০১টি মামলা সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় কমিটি। উল্লেখ্য ২০০১ থেকে ২০০৬ মেয়াদে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের সময়ে 'রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা' হিসেবে পাঁচ হাজার ৮৮৮টি মামলা সম্পূর্ণ প্রত্যাহার এবং ৯৪৫টি মামলা থেকে কিছু কিছু আসামিকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এই প্রক্রিয়ায় মোট ৭৩ হাজার ৫৪১ জন অভিযুক্তকে খালাস দেয়া হয়। এভাবে অপরাধের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা রাজনৈতিক বিবেচনায় ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ায় এবং 'হয়রানিমূলক মামলার' নামে ক্ষমতাসীন দলের নেতাণ্টকর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভিন্ন গুরুতর মামলা প্রত্যাহার হওয়ায় বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষ আস্থা হারাতে থাকবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাদের পরিবারগুলো দ্বিতীয়বার ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। একইসাথে অপরাধীরা অপরাধ করে যে পার পেয়ে যেতে পারে, সে দৃষ্টান্তই দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে।

স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ফজলুল হক আজিমের এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর জাতীয় সংসদকে জানান, প্রেসিডেন্ট জিলণ্টুর রহমান ২১ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ মওকুফ করেছেন। যার মধ্যে অন্যতম আলোচিত হলো এ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম হত্যা মামলার আসামী আওয়ামী লীগ নেতা আবু তাহেরের ছেলে বিপণ্টব। উলেণ্টখ্য এরশাদের শাসনামলে ১ জন এবং ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ এর আমলে ১ জন এ ধরনের মুক্তি পেয়েছিল। ফলে প্রেসিডেন্টের এ ধরনের রাজনৈতিক বিবেচনায় ক্ষমা প্রদান আইনের শাসনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের বিচার প্রাপ্তির অধিকারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো হয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে।

সারা দেশে গণমাধ্যম কর্মী ও সাংবাদিক নির্যাতন এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। ১১ ফেব্রুয়ারি নিহত সাংবাদিক দম্পত্তি সাগরণ্ট রুনির হত্যাকারীদের গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। অধিকারণ্টএর তথ্য অনুযায়ী, ২০১২ সালে ৫ জন সাংবাদিক নিহত, ১৬১ জন আহত, ৬৩ জন হুমকির সম্মুখীন, ১০ জন আক্রমণের শিকার, ৫০ জন লাঞ্ছিত ও ১ জন র‍্যাব এবং ১ জন ডিবি পুলিশের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। এছাড়া দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে বিভিন্নভাবে হেনস্থা করা হয়।

রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হলো তার দেশের জনগণের জানমালের নিরাপত্তা তথা বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে তার জনগণকে রক্ষা করা। ভারতের সাথে করিডোর সংক্রান্ড় চুক্তি আশাবাদ জাগালেও সীমান্ড় হত্যা বন্ধ থাকেনি। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, ২০১২ সালে বিএসএফ কর্তৃক ৩১৯টি নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে যা আগের বছর ছিল ১৫৫। ভারতণ্টবাংলাদেশ সীমান্তে ৪৮ জন নিহত হওয়া ছাড়াও ১০৬ আহত ও ১৪০ জন অপহৃত হয়েছেন। অথচ দুই দেশের চুক্তি অনুযায়ী কোনো পক্ষই অপর পক্ষের সাধারণ মানুষের ওপর গুলি চালাতে পারে না। পরিস্থিতির প্রয়োজনে সর্বোচ্চ রাবার বুলেট ব্যবহার করতে পারবে। উল্টো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর সীমান্তে গুলির পক্ষে মত দিয়ে জানিয়েছেন, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সদস্যদের গুলি ছোঁড়ার অনুমতি দেওয়ার বিষয়ে নয়াদিল্লির সাথে তিনি একমত হয়েছেন। তার মতে, 'আত্মরক্ষার' প্রয়োজনে দুই সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর গুলি ছোঁড়ার বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। অথচ ১৬ অক্টোবর ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব রাজকুমার সিং সাংবাদিকদের বলেছিলেন, সীমান্ত হত্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

গণপিটুনিতে ২০১২ সালে মারা গেছে ১২৬ জন যা গত বছর ছিল ১৩৪ জন। এ সকল তথ্যকে মানুষের বিকৃত ও অসুস্থ্য মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এ ধরনের মানসিকতা তৈরিতে রাষ্ট্রের অব্যাহত মানবাধিকার বিরোধী নিপীড়ন ও নির্যাতনকে দায়ী করা যায়। আবার কারা হেফাজতে মারা গেছে ১০১ জন যার মধ্যে কয়েদি ৩৪ জন ও হাজতি ৬৭ জন। দেশে ৬৮টি কারাগারে ৬৮ হাজার ৭০০ বন্দী রয়েছে যেখানে কারাগারগুলোর ধারণ ক্ষমতা ৩৩ হাজার ৫৭০।

সরকার ২০১১ সালের মার্চ মাসে আন্ড়র্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যাল গঠন করেছে। এই ট্রাইবুন্যাল ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে গণহত্যার বিচার করছে। মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, আব্দুল আলিম, জামায়াত নেতা গোলাম আজম, মতিউর রহমান নিজামী, দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, আব্দুল কাদের মোলণ্টা, আবুল কাশেম ও আবুল কালাম আজাদকে ইতোমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি সারা বছরব্যাপী আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে থেকেছে। ১৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান নিজামুল হক নাসিমের সাথে বেলজিয়াম প্রবাসী একজন আন্তর্জাতিক আইনবিশেষজ্ঞের মধ্যে স্কাইপ কথোপকথন পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন, যা নিয়ে জনমনে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। ১৯৭১ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হওয়ার এতো বছরেও অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্টদের বিচারের আওতায় আনতে না পারাটা ছিল দুঃখজনক একটি বিষয়। ওই অপরাধের বিচারের জন্য যে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে, আন্তর্জাতিক মানদন্ড বিবেচনায় নিয়ে সেটির বিচারিক কার্যক্রম পরিচালিত হবেণ্ট এমনটিই প্রত্যাশা। নইলে নতুন রূপে জনগণের মধ্যে শঙ্কার সৃষ্টি হতে পারে। তাই মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার হওয়াটা যেমন জরুরি তেমনি জরুরি তা যেন আন্তর্জাতিক মানদন্ডে হয়ণ্ট তা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলেও উদ্বেগ লক্ষ করা গেছে। বাংলাদেশে ২০১২ সালে মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডবিণ্টউ) তাদের বৈশ্বিক রিপোর্টের বাংলাদেশ অংশে প্রকাশ করেছে র‍্যাবের মাধ্যমে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের সংখ্যা কমলেও এধরনের হত্যাকান্ড এখনো অনেক বেশি। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকার দেশের রাজনৈতিক ও নাগরিক সমাজের কর্মকান্ড সীমিত করে দিয়েছে। আইন লঙ্ঘন করলেও নিরাপত্তা বাহিনীকে আইনি ব্যবস্থার মুখোমুখি না করে সরকার তাদের রক্ষা করছে। অপরদিকে গুম ও হত্যার তদন্ড় করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, মিয়ানমারের আরাকানে মুসলমান রোহিঙ্গাদের সাথে বৌদ্ধদের সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করলে সরকার আন্তর্জাতিক আইনি বাধ্যবাধকতা বিশেষ করে জাতিসংঘের রিফিউজি কনভেনশন অগ্রাহ্য করে তাদের পুশব্যাক করে। উলেণ্টখ্য, ৩টি সংস্থাকে সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে কাজ করতে বিরত রাখে। ২০০৯ সালের বিডিআর বিদ্রোহ এবং যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে ত্রুটিপূর্ণ আইন সংশোধন করতে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের দাবি সরকার উপেক্ষা করেছে বলে প্রতিবেদনটিতে জানানো হয়েছে। আবার শ্রমিকনেতা আমিনুলের হত্যাকান্ডের খবর ফলাও করে নিউ ইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, গেণ্টাবাল পোস্ট ও এবিসি নিউজে প্রকাশিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন

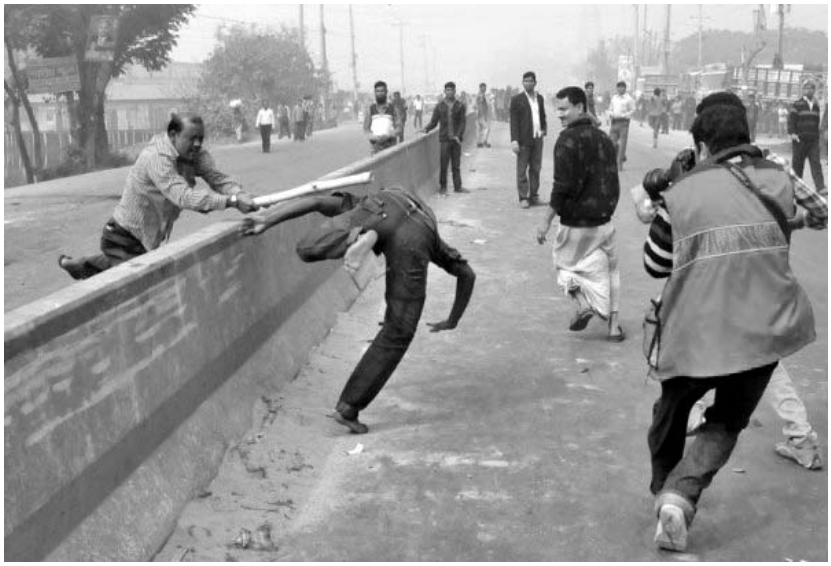

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন ও আমেরিকা, কানাডা এবং ইউরোপের পোশাক শিল্প ব্যবসায়ীদের সংগঠন সরকারকে চিঠি দেয়। অন্যদিকে রামুর ঘটনায় এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন ও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং শ্রীলংকা ও ফ্রান্সে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে।

মানবাধিকারের সাথে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি না হলে গণতান্ত্রিক পরিবেশের বিপর্যয় ঘটতে বাধ্য। গণতন্ত্র শুধু ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসা নয়, এর ব্যাপকতার সাথে সুশাসনও জড়িত। মানবাধিকার লঙ্ঘন করে দেশে সুশাসন তথা জনগণের শাসন কল্পনা করা যায় না। আইনণ্ট আদালত থেকে শুরু করে সরকারি সকল প্রক্রিয়ায় মুষ্ঠিমেয় কিছু মানুষ ও পার্টির ক্যাডারদের স্বার্থ রক্ষা করলে গণতান্ত্রিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হবেণ্ট এটাই স্বাভাবিক। অথচ বাংলাদেশে এখন এটিই ঘটছে। ফলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াতে প্রভাব পড়ছে। মানুষের মনোজাগতিকতায় এই ধারণা বাসা বাঁধছে যে, অরাজকতা ও সন্ত্রাসের কোনো সমাধান নাই। অপরাধ করলেও রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকলে ক্ষমা পাওয়া যায় এবং আরো বেশি ক্ষমতাবান হওয়া যায়। ফলে খুন, সন্ত্রাস, গণপিটুনির মতো ঘটনাগুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে দিন দিন। মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে। স্কুল কলেজে নারী উত্যক্তকরণের সংখ্যা বাড়ছে। গৃহকর্মীদের ওপরও নির্যাতন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিকে রাষ্ট্র নিজেই মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে, অন্যদিকে সন্ত্রাসী, দুস্কৃতকারী যারা মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে তাদের বিরুদ্ধে সরকার তথা আইনণ্টশৃঙ্খলা বাহিনী কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না। বরং উল্টো কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের মদদ দিচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষ এই দুই চক্রের যাতাকলে ক্রমাগত পিষ্ট হচ্ছে। জনজীবনের নিরাপত্তাহীনতা বেড়ে যাচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে গণতন্ত্র তথা অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে সার্বিক উন্নয়নে।

লেখা আহ্বান

মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার, নারীর অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার সংশিণ্টষ্ট বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানায়। পাশাপাশি পত্রিকা সম্পর্কে যেকোনো গঠনমূলক সমালোচনাও আমাদের প্রয়াসকে সমৃদ্ধ করবে। নাগরিক উদ্যোগ ত্রৈমাসিক নতুন লেখকদের লেখা প্রকাশেও আগ্রহী। লেখা পাঠানোর ঠিকানা: সম্পাদক, নাগরিক উদ্যোগ ত্রৈমাসিক, ৮/১৪, ব্লকণ্টবি, লালমাটিয়া, ঢাকাণ্ট১২০৭। ইমেইল :

২০১২ সালের ১১টি আলোচিত ঘটনা

০১	১০ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে নিজ বাসায় খুন হন সাংবাদিক দম্পত্তি সাগর-রুনি। পুলিশ হত্যাকারীদের গ্রেফতার করতে পারেনি।
০২	৫ মার্চ রাতে গুলশানে নিজ বাসার নিকটে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন সৌদি দূতাবাসের প্রশাসনিক কর্মকর্তা খালাফ মোহাম্মদ সালেম আল আলী। এ ঘটনায় পাঁচজনকে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
০৩	৪ এপ্রিল গার্মেন্ট শ্রমিক নেতা আমিনুল ইসলাম আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা নিখোঁজ হন। ৬ এপ্রিল তার গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া যায় টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে।
০৪	৯ এপ্রিল মধ্যরাতে তৎকালীন রেলমন্ত্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের এপিএস-এর গাড়িতে রেল মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ বাণিজ্যের ৭৪ লাখ টাকা পাওয়া যায়। এ ঘটনার জের ধরে তিনি ১৬ এপ্রিল পদত্যাগের ঘোষণা দেন।
০৫	১৭ এপ্রিল বিএনপি নেতা ও সাবেক সংসদ সদস্য ইলিয়াস আলী তার ড্রাইভার আনসারসহ মহাখালীর আমতলী এলাকা থেকে নিখোঁজ হন। তার নিখোঁজে গোয়েন্দা সংস্থার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। আজও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি।
০৬	২৯-৩০ সেপ্টেম্বর রামু, উখিয়া, টেকনাফ ও পটিয়ায় বৌদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধদের বাড়িঘরে সহিংস হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।
০৭	১১ নভেম্বর স্কুল ছাত্র পরাগ মন্ডল অপহৃত হয়। তার মুক্তি পণ হিসেবে দাবি করা হয় ৫০ লক্ষ টাকা। ৩ দিন পর তাকে উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জুয়েল মোল্লার নাম উঠে আসে এবং তাকে গ্রেফতার করা হয়।
০৮	২৫ নভেম্বর তাজরীন গার্মেন্টে আগুন লেগে পুড়ে মারা যায় ১১১ জন শ্রমিক।
০৯	পদ্মাসেতু দুর্নীতি বছরের আলোচিত ঘটনা। এ ঘটনায় যোগাযোগ মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ৫ ডিসেম্বর।
১০	৯ ডিসেম্বর বিরোধী দলের অবরোধ চলাকালে সরকারি দলের কর্মীদের অস্ত্রের আঘাতে পুরাণ ঢাকায় নিহত হন বিশ্বজিৎ দাস।
১১	হলমার্ক ও ডেসটিনি অর্থ কেলেঙ্কারি ২০১২ সালের অন্যতম আলোচনার বিষয় ছিল।

একনজরে ২০০৯-২০১২ মানবাধিকার পরিস্থিতি

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন	2009	2010	2011	2012
বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড	১৫৪	১২৭	৮৪	৭০
জেলখানায় মৃত্যু	৫০	৬০	১০৫	৬৩
গুম	৩	১৮	৩০	২৪
নির্যাতন (জীবিত ও মৃত)	৮৯	৬৭	৪৬	৭২
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ (নিহত, আহত নির্যাতন, আক্রমণ, ভীতি প্রদর্শন)	২২১	২৩১	২৫৯	২৮৯
বিএসএফ কর্তৃক হত্যা	৯৮	৭৪	৩১	৩৮
রাজনৈতিক সহিংসতায় মৃত্যু	২৫১	২২০	১৩৫	১৬৯
এসিড সন্ত্রাসের শিকার	১০১	১৩৭	১০১	১০৫
যৌতুক সংক্রান্ত সহিংসতা	৩১৯	৩৭৮	৫১৬	৮৩৮
ধর্ষণ	৪৫৬	৫৫৯	৭১১	৮০৫
গণপিটুনীতে হত্যা	১২৭	১৭৪	১৬১	১৩২
গার্মেন্ট দুর্ঘটনায় নিহত	৭	৩৩	৪	১১৫
১৪৪ ধারা জারি	২৮	১১৪	১০৩	১০৫

সূত্র: অধিকার-এর বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০১২।

মাজহারুল ইসলাম: গবেষক ও মানবাধিকারকর্মী।
ই-মেইল: mazhar1971@yahoo.com

হাজারীবাগ ট্যানারি নিয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচণ্টএর প্রতিবেদন

মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে চামড়া শিল্পের শ্রমিকরা

রাজধানীর হাজারীবাগের চামড়া প্রক্রিয়াজাত কারখানাগুলো শ্রমিকদের জীবনকে বিপন্ন আর আশপাশের পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলছে বলে মন্ড়ব্য করেছে আন্ড়র্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডবিণ্টউ)। নিউ ইয়র্কভিত্তিক এই সংগঠনটির অক্টোবর মাসে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্যানারির বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্যের কারণে হাজারীবাগে শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সী মানুষ নানা ধরনের রোগে আক্রান্ড় হচ্ছে। এছাড়া ট্যানারিগুলোর কাজের পরিবেশ মানসম্মত না হওয়ায় সেখানে নানা ধরনের দুর্ঘটনায় অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটছে। চামড়া শিল্পের রাসায়নিক বর্জ্যে আশপাশের এলাকার পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠছে বলেও হিউম্যান রাইটস ওয়াচণ্টএর প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে।

২০১২ সালের জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে মোট আট সপ্তাহ ধরে মাঠপর্যায়ে কাজ করে এইচআরডবিণ্টউ। এ সময় চামড়া শিল্পের শ্রমিক, মালিক, সরকারের বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তা, স্থানীয় অধিবাসী, শ্রমিকনেতা, মানবাধিকারকর্মীসহ ১৩৪ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। একইসাথে সংগঠনটি ১৯৯০ সাল থেকে চামড়াশিল্পণ্ট সংশিণ্টষ্ট নানা নথি পর্যালোচনা করে।

সংস্থাটি 'বিষাক্ত ট্যানারি: শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের ওপর বাংলাদেশের হাজারীবাগ চামড়া শিল্পের প্রভাব' (টক্সিক ট্যানারিজ: দ্য হেলথ রিপারকাশনস অব বাংলাদেশিস হাজারীবাগ লেদার) শীর্ষক ১০১ পৃষ্ঠার ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চামড়া শিল্পের বিষাক্ত বর্জ্যে কারখানায় কর্মরত নারী ও পুরুষের মধ্যে ত্বকের বিভিন্ন রোগ ও ফুসফুসের নানা জটিলতা ছড়িয়ে পড়ছে এবং ট্যানারির বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির কারণে দুর্ঘটনায় মানুষের অঙ্গহানি ঘটছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার বিভাগের জ্যেষ্ঠ গবেষক রিচার্ড পিয়ার্স হাউজ উল্লেখ করেন, 'ক্ষতিকর রাসায়নিকে হাজারীবাগের ট্যানারি পরিবেশ দূষিত করে তুলছে। সরকার এদিকে নজর না দেয়ায় স্থানীয় মানুষ অসুস্থ হওয়ার পাশাপাশি ট্যানারির ক্ষতিকর রাসায়নিকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ড় হচ্ছে শ্রমিকরা।'

ওই এলাকার মাটি, পানি ও বাতাসে ট্যানারির রাসায়নিকের দূষণে জ্বর, ত্বকের বিভিন্ন রোগ, ফুসফুসের সমস্যা ও ডায়রিয়ার মতো রোগ ছড়াচ্ছে বলে হাজারীবাগের বস্ড়িবাসী অভিযোগ করেছে। এখানে অল্প বয়সী শিশুরাও কাজ করছে। তারা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। এসব শিশু চামড়ার রাসায়নিক পরিষ্কার করে, রেজরবেণ্টড দিয়ে চামড়া কাটে, ট্যানারির বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি চালায়। মহিলা ও তরুণীরা অভিযোগ করেছে, পুরুষদের মতোই সমান কাজ করলেও তাদেরকে পুরুষদের চেয়ে অনেক কম মজুরি দেওয়া হয়।

প্রতিবেদনটিতে আরো বলা হয়েছে, হাজারীবাগের ট্যানারি থেকে ঢাকার প্রধান নদীতে (বুড়িগঙ্গা) যেসব বর্জ্য ফেলা হয় তার মধ্যে থাকে প্রাণীর মাংস, সালফিউরিক এসিড, ক্রোমিয়াম ও সীসা। সরকারি হিসাবে প্রতিদিন হাজারীবাগের ট্যানারি থেকে ২১ হাজার ঘনমিটার বিষাক্ত পানি ফেলা হয়। সরকারি কর্মকর্তা ও ট্যানারি মালিকরা বলেছেন, এসব কারখানার একটিতেও বর্জ্য পরিশোধনের (ইটিপি) ব্যবস্থা নেই।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এর মতে, সরকার চামড়া কারখানার শ্রমিক ও এলাকাবাসীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেয়নি। হাজারীবাগে শ্রম ও পরিবেশ আইন বাস্ড়বায়নেও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে সরকার। এছাড়া হাজারীবাগ থেকে চামড়া শিল্প সরিয়ে নেয়ার বিষয়ে হাইকোর্টের দেয়া রায়ও সরকার উপেক্ষা করেছে।

পিয়ার্স হাউজ বলেন, 'যেসব বিদেশি কোম্পানি হাজারীবাগে উৎপাদিত চামড়াপণ্য আমদানি করে, তাদের নিশ্চিত করা উচিত যে তাদের সাপণ্ডায়াররা স্বাস্থ্য নিরাপত্তাসংক্রান্ড় আইন লঙ্ঘন করছে না অথবা পরিবেশকে বিষাক্ত করছে না।'

১২ বছরের কমবয়সী শিশুদের গৃহকর্মে নিয়োগ করা যাবে না

১২ বছরের কমবয়সী শিশুদের গৃহকর্মে নিয়োগ করা যাবে না। এছাড়া ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশুদের গৃহকর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা এবং তার ব্যয়ভার গৃহকর্তাকে বহন করতে হবে। শিশুদের কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে ৫ ঘণ্টার বেশি একই সময়ে নিয়োজিত রাখা যাবে না। হাইকোর্টের এক রায়ে এমনটিই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। একইসাথে গৃহকর্মীদের ওপর সব ধরনের নির্যাতনও বন্ধ করতে বলেছেন আদালত। একটি রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট এই নির্দেশনা প্রদান করে। এছাড়া কোনো ধরনের অসামাজিক, অমর্যাদাকর ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের যাতে নিয়োজিত করা না হয় তা নিশ্চিত করার কথা বলা আছে জাতীয় শিশু নীতিতে। সুতরাং শিশুদেরকে গৃহকর্মে নিয়োজিত করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে।

বাংলাদেশে দলিত বিপন্নতা : সামাজিক ন্যায়বিচার ও আইনের স্বরূপ সন্ধান

এস.এম. মাসুম বিলণ্ঢাহ

Really, it takes the human mind to evolve so devilish…The sweeper is worse of than a slave, for the slave may change his master and his duties and may even become free, but the sweeper is bound for ever, born into a state from which he can not escape and where he is excluded from social intercourse and the consolation of his religion. Unclean himself, he pollutes others when he touches them [E M Forster, in the preface of Mulk Raj Anand's *Untouchable* (1935), at VI]

১. একজন বাখা, একজন রামগোলাম : দলিত শ্রেণীর চালচিত্র

মূলক রাজ আনন্দ ১৯৩৫ সালে ভারতের প্রেক্ষাপটে লিখেছিলেন তাঁর উপন্যাস 'Untouchable'। বাখা নামের এক দলিত বালককে নিয়ে তাঁর এই সাড়া জাগানো উপন্যাস। বাখাণ্ঢকে তখনকার মানুষজন নিজেদের তো ভাবেই নি। বরং তার মানুষ অস্ড়িত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে :

'You swine, you dog, why didn't you shout and warn me of your approach!'....Don't you know, you brute, that you must not touch me!' Dirty dog! Son of bitch! The offspring of a pig'!

বাখার কাছে মনে হতো প্রতিটি সেকেন্ডে যুদ্ধ আর যন্ত্রণার অনিঃশেষিত যুগ। তাই সে আমাদের মনস্ড়ত্ত্বে, আঘাত করে, "They think we are mere dirt because we clean their dirt"। আর হরিশংকর জলদাস ২০১২ সালে এসে চট্টগ্রামের মেথরপট্টির মানুষদের নিয়ে লিখছেন বাংলাদেশের দলিত মানুষের বঞ্চনার কথা। বাখার জায়গায় এখানে রামগোলাম। কিন্তু বাখা ছিল নমনীয়, আর রামগোলাম প্রতিবাদী। কিন্তু উপন্যাসের শেষে সর্বশান্ড় এবং শ্রান্ড় একজন 'দলিত'। 'নীরবে পট্টিতে পট্টিতে হাঁটে রামগোলাম। হরিজন পলণ্টীর নতুন প্রজন্ম তাকে চেনে না। হেঁটে হেঁটে রামগোলাম তাদের মধ্যে কার্তিককে খুঁজে বেড়ায়। অন্য একজন কার্তিক না হলে, অন্য একজন কার্তিক না জন্মালে রামগোলাম হরিজনমুক্তির আন্দোলন নতুন করে শুরু করবে কীভাবে?'

২. জাত গেল জাত গেল বলে একি আজব কারখানা!

বৃটিশ শাসনামলে ১৮৩৫ণ্ঢ১৮৫০ সালের মধ্যে দলিতদের একটি অংশকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, বিশেষ করে উত্তর প্রদেশ ও অন্ধ্র প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তথাকথিত বিভিন্ন ধরনের 'নিম্নশ্রেণী'র কাজ যেমনণ্ঢ জঙ্গল পরিষ্কার, আবর্জনা পরিষ্কার, মৃত পশুণ্ঢ পাখী সরানো ইত্যাদির জন্য তৎকালীন বৃটিশ ভারত তথা আজকের বাংলাদেশে আনা হয়। এরা বাঁশপুরী, ডোম, চা শ্রমিক, ডোমার, লালবেগি, মাইঠাল, বাল্মিকী, ফাসি, মেথর, চামার, মালা, মাদিগা, চাকালী, দেওয়ালী ইত্যাদি নামে পরিচিত। আবার ভারত থেকে আগমনের স্থানের এবং ভাষার ভিত্তিতে কানপুরী, তেলেগু বা মাদ্রাজী নামেও পরিচিত এসব জনগোষ্ঠী। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত বাংলাপিডিয়ায় ঢাকার পেশাজীবী হিসেবে মেথর বা ধাঙ্গড়দের আবির্ভাব সময় উলেণ্ঢখ করা হয়েছে ১৬২৪ণ্ঢ২৬ সালকে। ঐ সময় বার্ম অঞ্চলের দস্যুরা ঢাকায় নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায়। এই ধ্বংসযজ্ঞের লাশ সরানোর জন্য মেথর নিয়োগ করা হয়েছিল।

১৮৩০ সালে ঢাকা কমিটি এবং ১৮৬৪ সালে ঢাকা পৌরসভা গঠনের পর নগর জীবনের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজটিও পৌর কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছিল। এরই অংশ হিসেবে সুইপাররা তখন দিনমজুরির ভিত্তিতে ময়লা পরিষ্কারের কাজ করতো। ১৯০৫ সালে ঢাকা পূর্ববঙ্গের রাজধানী হওয়ার পর বাড়তি সুইপার প্রয়োজন হয়। তখন কানপুর, মাদ্রাজ, নাগপুর ইত্যাদি স্থান থেকে নতুন করে সুইপার আনা হয়। এ সময় থেকে পৌরবাসীকে পরিচ্ছন্নতার জন্য নির্দিষ্ট হারে পৌর কর দিতে হতো। ঢাকাকেন্দ্রিক নাগরিক উন্নয়নধারায় দলিতরা এভাবে পুরানো অংশীদার হলেও নগর ঢাকার চার শত বছর পূর্তি উৎসবে কখনো দলিতদের অবদানের স্বীকৃতি মেলেনি। এখানে সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন পরিকল্পনায় দলিত সম্প্রদায় সবসময়ই বঞ্চিত। দেশের মুখ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক তাদের নিয়ে ব্যাপক কোনো গবেষণাও হয়নিণ্ঢ যা থেকে দলিতদের অবস্থা সম্পর্কে একটি সার্বিক চিত্র পাওয়া যায়।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি। এর মাঝে দলিতদের সংখ্যা প্রায় অর্ধকোটি। দলিতদের মাঝে বহু সম্প্রদায় ও জাতিসত্তা রয়েছে। যার একটি হলো জাতণ্ঢসুইপার সম্প্রদায়। দেশের প্রায় সব জেলাতেই জাতণ্ঢসুইপারদের উপস্থিতি রয়েছে। তবে ঢাকা ও সিলেটেই কেবল তাদের উপস্থিতি ব্যাপকভিত্তিক। ঢাকায় ওয়ারী, নাজিরাবাজার, গণকটুলি, গাবতলী, শেরেবাংলা নগর, সায়েদাবাদ, ধলপুর, গোপীবাগ ইত্যাদি স্থানে থাকে জাতণ্ঢ সুইপাররা বসবাস করে থাকেন। টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জের মাঝে অন্ড়ত ২৭টি স্থানে 'জাতণ্ঢসুইপারদের কলোনি আছে।

এসব স্থানে 'জাতণ্ডসুইপারদের সম্মিলিত সংখ্যা হবে ৩৫ থেকে ৪০ হাজার। তবে সঠিক কোনো শুমারি নেই। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ১৯৮৮ সালের এক হিসাবে তাদের পরিচ্ছন্নতা কর্মীর সংখ্যা ৯৬৯০ বলে উলেণ্ডখ করা হয়েছে।

সরকারি শুমারি রিপোর্টে সুইপারদের হিন্দু ধর্মাবলম্বী হিসাবে উলেণ্ডখ করা হয়। পেশাগতভাবে উলেণ্ডখ করা হয় না তাদের পরিচয়। এ বিষয়ে দলিতরা বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে আবেদন করেছিলণ্ড তাদের যেন পেশাগতভাবে গণনা করা হয়ণ্ড কিন্তু সে আবেদন রক্ষিত হয়নি। সাতক্ষীরায় কিছু আঞ্চলিক শুমারির মাধ্যমে দেখা গেছে শুমারিতে যাদের হিন্দু হিসেবে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে তাদের মধ্যে ২৫ণ্ড ৩০ ভাগ হলো দলিত কিংবা নমঃশূদ্র। যেমনণ্ড সেখানে ঋষি, কাওরা, মুন্সা, বাগদিণ্ড সবাই হিন্দু হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছেন। বৃহত্তর ঢাকায় দয়াগঞ্জ, গণকটুলি, নাজিরাবাজার, টঙ্গী, সায়েদাবাদ ও নারায়ণগঞ্জে সবচেয়ে বেশি দলিত সুইপারের বাস। এর মধ্যে গণকটুলিকে সবচেয়ে বড় সুইপার কলোনী হিসেবে ধরা হয়। তেলেগুদের অবস্থান প্রধানত ওয়ারী, টিকাটুলি, ধলপুর ও গাবতলীতে। অন্যদিকে, কানপুরীরা থাকেনণ্ড গণকটুলি, টিকাটুলি, নাজিরাবাজার ও নারায়ণগঞ্জে।

জাতিগত পরিচয় বিতর্কের দুটি দিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, একটি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে সংখ্যাগরিষ্ঠরা কী নামে অভিহিত করে এবং দ্বিতীয়ত, ঐ জনগোষ্ঠী নিজে কী নামে পরিচিত হতে আগ্রহী? বলা বাহুল্য, বিতর্ক মীমাংসার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পথটিই বেশি সহায়ক। কিন্তু তাদের ঘিরে পরিচয় বিতর্ক এখনো পুরোপুরি মীমাংসিত হয়নি। গান্ধীজী তাদের নাম দিয়েছিলেন 'হরিজন' বা বিধাতার সন্তান। কিন্তু মহাত্মা যে চেতনা থেকে নামটি দিয়েছেন তার প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখানোর মতো সামাজিক জীব আমরা নই। অবজ্ঞা ও ঘৃণার প্রবাহে তারা পেয়েছে মেথর, সুইপার, দূর্গত ইত্যাদি নাম। ভারতীয় সাংবিধানিক মানদন্ডে 'সিডিউলড কাস্ট'...ইত্যাদি। সামাজিক বর্ণ বৈষম্যে এই সম্প্রদায়ের মানুষরা নিজেদের 'নিষ্পেষিত'ণ্ড এর কাতারে ফেললেন। 'দলিত' হয়ে তাদের সংগ্রামী চেতনার জানান দিতে লাগলেন। আজকে তাই আমরা 'দলিত' শব্দটির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছি। দলিত শ্রেণীর বিষয়টি বোধ হয় 'subaltern' অধ্যয়নের বিষয়বস্তু হয়ে গেছে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে 'সাবণ্ডঅলটার্ন কারা? এইচ.সি.হাজেলা নামে একজন লিখছেন, "এরা কি সেই নিঃস্ব গোষ্ঠী যাদের জন্য মার্কস বিপণ্ডবের ডাক দিয়েছেন, তারা অর্থনৈতিকভাবে অরক্ষিতজন গ্রামসি যাদেরকে বলেছেন 'subaltern', নাকি এটি একটি অভাব ও ইচ্ছার মানসিক অবস্থা, যাকে লাঁকা নাম দিয়েছেন, 'অন্যণ্ডমনস্কতা' (otherness)? খুব সম্ভব, সাবণ্ডঅল্টার্ন ডিসকোর্স এর সবগুলোর সমন্বিত রূপ। দলিত শ্রেণী বলতে শ্রেণী/বর্ণ/লিঙ্গ নির্বিশেষে অধীনস্থ হয়ে যাওয়া জনগোষ্ঠীকে বুঝায়, যারাণ্ডLowliest, Lost এবং Last.

৩. দলিতদের বর্তমান হাল: সবি দেখি তা না না

দলিতদের বর্তমান অবস্থাকে খুব অল্প কথায় বর্ণনা করা মুশকিল। তবুও তাদের অবস্থা বোঝার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর নজর দেয়া যেতে পারে :

১। ধর্মের প্রশ্রয়ে অবজ্ঞা ও অস্পৃশ্যতার শিকার ['তোরা ছোট লোকের বাচ্চা, তোরা চলে যা', 'তুই বুনো সরে বস']।

২। বসবাসের জায়গার অপ্রতুলতা ('সংসার বাড়লে রুমের মধ্যে পার্টিশান বাড়ে')। মানিক বন্দোপাধ্যায়কে মনে পড়ে, "দেখে মনে হয় এ তাদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা, কিন্তু একটু চিন্তা করলে বুঝা যায়, ঈশ্বরের পৃথিবীতে মাথা গোঁজার ঠাঁই তাদের ঐ টুকুই। ঈশ্বর এখানে থাকেন না, ঈশ্বর থাকেন ঐ ভদ্র পলণ্ডীতে"।

৩। উচ্ছেদ আতঙ্ক [নওগাঁর উচ্ছেদ ঘটনা (২০০৫), মোহাম্মদপুর মাদ্রাজী সুইপার কলোনী উচ্ছেদ]।

৪। অর্থনৈতিক উদারীকরণের আক্রমণ এবং 'জাতণ্ডসুইপার ও মুসলিম সুইপার দ্বন্দ্ব।

৫। সংগঠন চেতনা অনুপস্থিত।

৬। সাংস্কৃতিক আক্রমণ, দারিদ্রতা, ধর্মান্ডতা।

৪. সাংবিধানিক প্রতিজ্ঞা : দলিতরা কি বাংলাদেশের অ-জনগণ?

বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম তিনটি শব্দই মহাউত্থানের, 'আমরা বাংলাদেশের জনগণ'। শব্দগুলো পড়ার সাথে সাথে হৃদয়ে অনুরণন জাগে, সংবিধানের ওপর নিজের মালিকানার বোধ জাগে। প্রস্তাবনার যবনিকাতেই 'জনগণ' শব্দের প্রতিধ্বনিণ্ড 'আমরা আমাদেরকে এই সংবিধান দিচ্ছি'। তাই আমরা বলি জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছার প্রতিফলন

সরকারি শুমারি রিপোর্টে সুইপারদের হিন্দু ধর্মাবলম্বী হিসাবে উলেণ্ডখ করা হয়। পেশাগতভাবে উলেণ্ডখ করা হয় না তাদের পরিচয়। এ বিষয়ে দলিতরা বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে আবেদন করেছিলণ্ড তাদের যেন পেশাগতভাবে গণনা করা হয়ণ্ড কিন্তু সে আবেদন রক্ষিত হয়নি।

এই সংবিধান। রাষ্ট্রের যেকোনো কাজের ভিত্তি তাই জনগণের ইচ্ছার বাইরে রচিত হতে পারে না। এ এক সামষ্টিক ইচ্ছা, সম্ভবত জঁ জাক রুশোর 'সামাজিক চুক্তি'ণ্ডর পরিশীলিত উপস্থাপনা, যেখানে জনগণ শুধু সার্বভৌমই নয়, আইনের আনুষ্ঠানিক উৎসও বটে। তাই আমরা আইনের শাসন ও সামাজিক ন্যায়বিচার এর কথা যখন পড়ি, তখন সব মানুষের অধিকারের কথাই চেতনে বুঝাতে চাই। এমন একটা আইন ব্যবস্থার কথা আমার কল্পনা করেছি জনগণ হবে যার উদ্যোক্তা। ভন সেভিনি যেটিকে বলছেন, 'Volkgeist'– Public Spirit বা জনগণের চেতনা। অষ্টিনিয়ান আইনী মতবাদ আমাদের সংবিধান প্রত্যাখান করেছে, 'আমরা বাংলাদেশের জনগণ' শব্দগুলোর মাধ্যমে। সংবিধানের মানসে, মননে তাই 'প্রজাতন্ত্র'। জনগণের পরম ইচ্ছার প্রতিফলনরূপে, সংবিধান তাই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। রাষ্ট্রের মূলনীতিতে আমরা বলেছি স্থানীয়ভাবে জনগণের শাসন শক্তিশালী করা, নারীর ক্ষমতায়ন, মালিকানা, কৃষকণ্ডশ্রমিক মেহনতি মানুষের মুক্তির কথা। সামাজিক ন্যায়বিচারের শর্ত হিসাবে মৌলিক চাহিদাপূরণ, কৃষি বিপণ্ডব, পলণ্ডী উন্নয়ন, জীবনণ্ডযাত্রার মান উন্নয়ন, কাজের সুযোগ সৃষ্টির কথা সংবিধান

ভাষায়। এগুলোকে আমি 'জনগণের আইনী' ক্ষমতায়নের নিয়ামক হিসাবে দেখি। মেহনতি মানুষের মুক্তি আমাদের অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের প্রাণ। সংবিধানের ৮নং অনুচ্ছেদ বলছে, রাষ্ট্রের এই মূলনীতিগুলো হবে, বাংলাদেশ পরিচালনার মূলভিত্তি, সকল কাজের সৃষ্টিস্থল, সংবিধান ও আইনব্যাখ্যার আলোকবর্তিকা।

সংবিধানের লোকায়ত চরিত্র আমরা ফেরত পেয়েছি 'Secularism' পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবেণ্ঢ'মানুষ', সেক্যুলারিজম ছাড়া তো অর্জন করা সম্ভব নয়। একজন মনীষী যথার্থই বলেছেন, 'If secularism collapses as a casualty of communalism, humamism has no hope of survival as a basic creed of a nation'. আমার তো মনে হয় 'humanism' এখন আমাদের যেকোনো রাষ্ট্রীয় আচারের মূল চেতনা হওয়া উচিত। না হলে ইগালেটারিয়ান সমাজ বিনির্মাণের যেকোন ধারণা মার খেতে বাধ্য। সমতাভিত্তিক সমাজ সভ্যতার মানদন্ড। নমস্য বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক, ২০০৫ সালের **শামীমা সুলতানা সীমা** মামলায় উলেণ্ঢখ করেন: "This right of equality evolved in the Garden of Eden and was cherished through the civilizations. It is a barometer of the refinement of civilization in any country."

Indra Sawhney gvgjvq *(1993)*, বিচারপতি Jeevan Reddy মন্ড্ব্য করেন: "For assuring equality of opportunity, it may well be necessary in certain situation to treat unequally situated persons unequally. Not doing so, would perpetuate and accentuate inequality."

আসলে বৈষম্যহীনতা আর শোষণহীনতা মৌলিক অধিকার ভোগের চাবিকাঠী। এক্ষেত্রে আইনী ক্ষমতায়নের প্রশ্ন আসে। মানুষকে তার মানবিক মর্যাদা রক্ষার জন্য সামর্থ্যবান করে গড়ে তোলাকেই আমি ক্ষমতায়ন বলবো। ক্ষমতায়ন শুরু হয় কখন? মানুষ যখন তার ক্ষমতাহীনতার বিষয়টি টের পেতে শুরু করে, ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া তখনই শুরু হয়। আইনী ক্ষমতায়ন নির্দেশ করে যে, মানুষ তার অবস্থান ও সামর্থ্যের পরিবর্তন চায়, তাদের জীবনের উপর প্রভাব ফেলে এমন বিষয়ে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চায়। বিজ্ঞ লোকেরা, যেমন জুডি চেম্বারলিনের নাম নেয়া যেতে পারে, যিনি 'ক্ষমতায়ন' শব্দের নিম্নোক্ত মানেগুলো বের করেছেন,

১) সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করার ক্ষমতা
২) তথ্য ও সম্পদে প্রবেশ্যতা
৩) পছন্দের স্বাধীনতা
৪) নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ
৫) নিজেকে বদলে দেয়ার শিক্ষা
৬) সংঘবদ্ধ ক্ষমতার সাথে আমাদের সম্পর্ক পুননির্ধারণ করার ক্ষমতা
৭) শ্রেণীবদ্ধ থাকার চেতনা
৮) অধিকার সচেতনতা
৯) কাজ করার ক্ষমতা
১০) নিজের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা ও সংকট মোকাবিলা করার ক্ষমতা।

বাংলাদেশের ৫৫ লাখ দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের এই বিষয়গুলোর কথা না ভাবলে সাংবিধানিক চেতনা মার খেতে বাধ্য। আসলে ক্ষমতায়নের ধারণা মৌলিক মানবাধিকার ধারণা থেকে পৃথক করা যায় না। একজন মানুষকে 'মানুষ' হিসাবে উপস্থাপন করার জন্য যে সামগ্রিকতার প্রয়োজন, তাকেই আপনি ক্ষমতায়নের বিষয়বস্তু ভাবতে পারেন। যার মূলে রয়েছে 'মানবিক মর্যাদা ও মানব সত্ত্বার বিকাশ'। কিন্তু ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি আসছে কেনণ্ঢ বিশেষ করে দলিতদের ক্ষমতায়ন বিশেষণ দিয়ে? কারণটা বোধ হয় সোজাণ্ঢ সমাজ অসমতার উৎসের মধ্যে নিমজ্জিত। ধনী দরিদ্রের ব্যবধান এখানে আকাশণ্ঢপাতাল। যাদের সম্পদ/ক্ষমতা আছে তারা নিজেদেরকে 'জনগণ' শব্দের সংজ্ঞার বাইরে নিয়ে যেতে পেরেছেন, আর দারিদ্র কিছু মানুষের অলংকার হয়ে তাদেরকে জনতা, আমজনতা, সাধারণ, বঞ্চিত, দলিত ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করেছে; যারা শুধু ভাবতে শিখেছে,

'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান'! ভারতের নমস্য বিচারপতি ভি. আর. কৃষ্ণা আয়ারের তির্যক মন্ড্ব্যটি এখানে প্রাসঙ্গিক হতে পারে :

"They are a class in the cosmos, devoid of civilized amenities. These 'unpeople' living in dirt and squalor are allergy to the elite, anathema to the higher judiciary, exasperation to the creamy layer and nouveau riche, who have happy hopes, and A.C. cars, mobile phones, security guard and business class travels."

আইন এখন ক্ষমতার মানদন্ড সংজ্ঞায়িত law is equal to Power and vice-versa. কিন্তু আনাতোঁলে ফ্রান্স আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন: 'The law in its majestic equality forbids the rich as well as the poor to sleep under bridges, to beg in the streets and to steal bread.' তাই আইন সুরক্ষার প্রশ্ন আসে। সংবিধানের প্রতিজ্ঞা সমুন্নত রাখার জন্য নিম্নোক্ত জনগোষ্ঠীর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে:

১) দূরতম এলাকায় বসবাসকারী মানুষজন যারা প্রথাগত আইন দ্বারা পরিচালিত হয়, যেমনণ্ঢক্ষুদ্র নৃণ্ঢতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী।
২) সমাজের সামন্ড় শ্রেণীর মানুষের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মানুষ।
৩) প্রান্ড়িক কৃষক বা পেশাজীবী যারা জনকল্যাণমূলক আইনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং যারা তাদের ভিটেমাটি বেচতে বাধ্য হয়।

> একজন জেলে মাছ ধরে, কিন্তু জলমহালের ওপর কি তার মালিকানা আছে? জলমহাল ইজারা চলে যাচ্ছে মূলধন যার আছে তার হাতে। তাহলে সমাজের ক্ষমতা কাঠামোতে প্রান্তিক জেলের ক্ষমতায়ন কীভাবে হবে? 'জাল যার, জলা তার'ণ্ট নীতি কি আইন নিশ্চিত করতে পেরেছে?

৪) সামাজিক নিরাপত্তা এবং সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ বঞ্চিত মানুষ; যারা নাকি তাদের মালিক কর্তৃক বাজে মামলার শিকার হয়।

৫) আইনি অসমতা, লৈঙ্গিক বৈষম্য এবং সহিংসতার শিকার নারী জনগোষ্ঠী।

৬) বৈষম্যের শিকার শিশু।

৭) সামজিক বৈষম্যের শিকার যেমনণ্ট দলিত, হিজড়া ইত্যাদি।

৮) ধর্মীয় ও ভাষাতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু।

৯) অন্যায়ভাবে আটক মানুষ।

এর সঙ্গে যুক্ত করুন শারীরিক প্রতিবন্ধী, উদ্বাস্তু এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার মানুষ। মানবজাতির প্রগতিশীল আশাণ্ট আকাঙ্খা এই সকল মানুষকে বাদ দিয়ে কখনও সার্থকতা অর্জন করতে পারে না। আইনি ক্ষমতায়নের অংশ হিসাবে এইসব জনগোষ্ঠীকে শুধু সঠিক সেবাণ্টসুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা করলেই হবে না, তাদের প্রেক্ষিত সংশিণ্টষ্ট আইনবিজ্ঞানের উন্মেষ ঘটাতে হবে, জনগণের জন্য পদ্ধতিগত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য। একেই বলা যাবে People's law কিংবা 'People's law Service'. অতএব ব্যাপারটা হলোণ্ট আপনি ফৌজদারি আইন বলেন, শ্রম আইন বলেন, প্রশাসনিক আইন বলেন, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য ঐগুলোকে একটা জনবান্ধব আইনবিজ্ঞানের সঙ্গে গেঁথে দিতে হবে।

৫. 'হে দারিদ্র্য ! তুমি মোরে করেছ মহান!'

দারিদ্র্যকে সংজ্ঞায়িত করার কিছু নেই। দারিদ্র্যকে বুঝতে হয়। দারিদ্র্য মানে এক হয় অস্তিত্বের সংকট, মৌলিক চাহিদা পূরণের ন্যূনতম অবস্থা। আর এক হয় তুলনামূলক বঞ্চনা। অন্যের তুলনায় বস্তুগত ও সামাজিক পশ্চাৎপদতা। নোবেলজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেন দরিদ্রতার ধারণায় নতুন মাত্রা এনেছেন। অধ্যাপক সেনের মতে, 'সক্ষমতা বঞ্চনা 'capability deprivation' -ই দারিদ্র্য। কোনো মানুষের নিজেকে মেলে ধরার স্বাধীনতাহীনতাই দারিদ্র্য'। অধ্যাপক সেন বলছেন, "The hopeless underdog losses the courage to desire a better deal and learns to take pleasure in small mercies" (Amartya Sen, Values and Development, 1984 at 5). বাংলাদেশে দলিতদের অবস্থা বুঝাতে এই উক্তির চেয়ে আর ভালো প্রকাশক কী হতে পারে? তাই আইনি ক্ষমতায়নের প্রশ্ন বুঝতে হলে দরিদ্রতার এই দিকটি আমাদের বুঝতে হবে। আইনে যখন 'Justice syndrome' থাকে না, তখন আমি একে বলি আইনের দারিদ্র (Poverty of law)। তাই 'legal empowerment of the poor' 'legal empowerment of the law' ছাড়া সম্ভব নয়। একটা আইন কীভাবে প্রণীত হয় সে প্রশ্ন এখানে আসে। আইনের শাসন নিশ্চয়ই মন্দ আইনের শাসন নয়।

আইনের শাসনকে অর্থবহ হতে হলে আইনটাকেই সৎ হতে হবে, দরিদ্রবান্ধব হতে হবে, জীবন সংশিণ্টষ্ট হতে হবে। কেননা, 'life of law is not logic, but experience.' আইনকে যদি জীবনের সেবক হতে হয়ণ্ট যে জীবনের কপাল রক্তে রঞ্জিত, শ্রমে জর্জরিত, নিষ্পাপ অশ্রুর আর সংগ্রামে ভেজাণ্ট তাহলে বিচার পদ্ধতির যেমন দহন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন আমাদের মতো করে একটা বাংলাদেশী আইন ব্যবস্থার পুনর্জন্ম ণ্ট এটা সম্ভবত স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বড় অমোঘ প্রত্যাদেশ। একজন জেলে মাছ ধরে, কিন্তু জলমহালের ওপর কি তার মালিকানা আছে? জলমহাল ইজারা চলে যাচ্ছে মূলধন যার আছে তার হাতে। তাহলে সমাজের ক্ষমতা কাঠামোতে প্রান্তিক জেলের ক্ষমতায়ন কীভাবে হবে? 'জাল যার, জলা তার'ণ্ট নীতি কি আইন নিশ্চিত করতে পেরেছে? একদিকে জেলে যেমন জলমহালের ওপর তার অধিকার হারাচ্ছে, অন্যদিকে হঠাৎ কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে জালণ্টনৌকা হারিয়ে মাথায় হাত দিচ্ছে। পরিণাম? মহাজনের কাছ থেকে ঋণণ্ট শোষণের যাঁতাকলে পদনিক্ষেপ? সুতরাং জেলের সামর্থ্যকে ভিত্তি দেয়ার প্রচেষ্টা কোথায়? মানিক বন্দোপাধ্যায়কে মনে পড়ে, "এরা ধর্মের চেয়ে বড় অধর্মকে লালন করে, দারিদ্র্য"! আরেকটা উদাহরণ দেই। যন্ত্রচালিত তাঁতের সামনে হস্তচালিত তাঁতের স্থান কই? ফলে সাধারণ তাঁতী (জোলা) কি তার ভাগ্যের পরিবর্তন কখনও করতে পারবে? না আছে এখানে রাষ্ট্রের দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো উদ্যোগ, না তাঁত বোর্ড আইন পেরেছে তাদের অবস্থার উন্নতি করতে?

৬. প্রতিকারমূলক ন্যায়বিচারও দরকার :

এশিয়াড প্রজেক্ট মামলায় (১৯৮২) ভারতের বিচারপতি পি. এন. ভগবতী মন্তব্য করেন: "It would be a travesty of justice to hold the employee in such a case to the terms of the contract and to compel him to serve the employer even though he may not wish to do so. That would aggravate the inequality and injustice from which the employee even otherwise suffers on account of his *economically disadvantaged position and lend the authority of law to the exploitation of the poor helpless* employee by the economically powerful employer". (Emphasis Supplied)

জবরদস্তিমূলক শ্রমের শিকার দলিতদের জন্য এই উক্তি সান্ত্বনা হতে পারে। সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণাকে এখন প্রতিকারমূলক ন্যায়বিচার হিসাবে দেখার সুযোগ এসেছে। বিচারিক ন্যায়বিচারকে তাৎপর্যময় করার জন্য বিচারিক ন্যায়বিচার এবং প্রশাসনিক ন্যায়বিচারণ্টএর উৎকর্ষতা বাড়াতে হবে, একজন ধর্ষিতা বালিকার পক্ষে আদালতের একটা রায় অপ্রতুল বনে যায়, যদি আমরা তার সামাজিক সুস্থিতি নিশ্চিত না করতে পারি। হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকা প্রৌঢ়া নারীর সন্তানের Medical justice নিশ্চিত হবে কীভাবে, যেখানে Medical negligence কে আমরা আইনের আওতায় আনতে পারিনি? এই পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করুন একজন দলিতের কথা, ডাক্তারের চেম্বারেই যে হয়তো অপাংক্তেয়। বাঁশের সাঁকো পার হয়ে স্কুলে যাওয়া ছেলেগুলো, পাঁয়ের নিচে তখনই মাটি পাবে যখন, তাদের জন্য পুল নির্মাণ করা হবে। বস্তি উচ্ছেদ করার আগে বুঝতে হবে

বস্তিবাসীরা শখে বস্তিবাসী হয় না। আসক-এর করা বস্তি উচ্ছেদ মামলার এই অংশটুকু স্মরণ করুন:

Bangladesh came into being as a fulfillment of the dreams of the millions of Bangalees so that they can breathe in an independent country of their own. They knew that their country is not rich but expected that social justice shall be established and the people shall be provided with the bare minimum necessities of life.

সামাজিক ন্যায়বিচারের এ এক চমৎকার উপলব্ধি। এখন প্রতিকারমূলক ন্যায়বিচার, যাকে আমি দলিতদের ক্ষমতায়নের অনুষঙ্গ বলছি, দাবি করে যে, এই সব প্রান্তিক মানুষের জন্য খাসজমি জমি বন্দোবস্ত নীতিমালার দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রয়োগ হবে। এটাই আইনে দলিতদের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রথম দৃশ্যমান পদক্ষেপ হতে পারে।

৭. দলিত সুরক্ষা: আইনের স্বরূপ সন্ধান

"No country can grow and develop where there is no order, and a society without equal justice will self-destruct. There must be law and that law must be tampered by justice. And that justice must be for all!"

-(মেলভিন পি সাইকস, Preface to *Administration of Injustice*, at x)

দলিতদের সুরক্ষায় আইনের চাঁদোয়া এখন সময়ের দাবি। আমাদের প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্র 'Untouchability Offences Act, 1995 (পরবর্তীতে যার নাম হয়েছিল, Protection of Civil Liberties Act) এবং Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Attrocities) Act, 1989 করে দলিতদের সুরক্ষায় আইন প্রণয়ন করেছে। নেপালও পিছিয়ে নেই। নেপালের আইনটির নাম 'Caste-based Discrimination and Untouchability (Offences and Punishment) Act, 2011'. বাংলাদেশে দলিত নেই একথা বলে আমাদের পার পাবার জো নেই। তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করে, দীর্ঘ বঞ্চনা থেকে মুক্তি দেয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব আন্তর্জাতিক আইন বিজ্ঞান, সংবিধান ও নৈতিকতা থেকে জাত। পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর মঙ্গলার্থে আইন করা সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদের চেতনা। এখানে দলিতদের সুরক্ষায় প্রণীতব্য আইনের কিছু বিশেষ দিক প্রস্তাব করা যেতে পারে:

১। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, সংবিধান এর দোহাই পূর্বক একটি তাৎপর্যপূর্ণ মুখবন্ধ।

২। দলিত, জাত-পাত ও পেশার ভিত্তিতে বৈষম্যকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়ন ও নিষিদ্ধকরণ।

৩। নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে শাস্তির আওতায় আনয়ন

i) সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন স্কুল, হাসপাতালে দলিতদের প্রবেশে অস্বীকৃতি।

ii) উন্মুক্ত প্রার্থনা স্থলে কাউকে প্রার্থনায় বাধা দান।

iii) অস্পৃশ্যতার ভিত্তিতে কাউকে অপদস্ত করা।

iv) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অস্পৃশ্যতার প্রচার।

v) ঐতিহাসিক বা দার্শনিক কারণ দেখিয়ে অস্পৃশ্যতাকে যথার্থতা দান।

vi) বর্ণপ্রথাকে লালন করা।

৪। দলিতদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য উপযুক্ত প্রতিকার (ক্ষতিপূরণসহ), প্রতিকার চাওয়ার উপযুক্ত, সহজ, বিচারিক ও প্রশাসনিক ফোরাম তৈরি।

৫। অভিযোগ অনুসন্ধান ও তদন্ত পদ্ধতি তৈরি।

৬। অন্যান্য আইনের সাথে আন্তঃসম্পর্ক ইত্যাদি।

সুনির্দিষ্ট আইনের পাশাপাশি নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোর আইনি ও সরকারি নীতিগত দিক সংস্কারের আওতায় আনতে হবে:

১। ভূমি সংস্কার ও খাস জমি বণ্টন ২। চাকুরিতে কোটা পদ্ধতি ৩। খাদ্য রেশনিং ৪। স্বাস্থ্য স্কীম ৫। শিক্ষা কোটা ৬। কাজের নিশ্চয়তা ৭। আশ্রায়ণ ৮। জনপ্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দান।

আমরা অনেকেই যারা 'বিশিষ্ট' নাগরিকের তকমা লাগিয়ে, সমাজ মনস্তত্ত্বে 'বৈষম্যে'র ঘুণ ধরিয়েছি, তারা 'কোটা' বা 'রিজারভেশন' শব্দ শুনলে আঁতকে উঠি। 'মেধাবী'-দের জন্য তখন আমাদের প্রাণ কাঁদে। এ বিষয়ে খুব বেশি না বলে মহাত্মা বি. আর. আম্বেদকরকে আবার স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলছেন:

There is another matter which must be a special concern to the Depressed Classes for their safety. That relates to their entry into the public services. The power to administer laws is not less important than power to make laws. And the spirit of the legislators may easily be violated if not nullified by the machinations of the administrator.....the best antidote against it is to insist on a proper admixture of castes and creeds including the Depressed Classes in the public services of the country.

-[Ambedkar: *States and Minorities* (1947) at 127]

আমাদের মনে রাখতে হবে প্রলেতারিয়েতরাই প্রলেতারিয়েতদের ভাষা বুঝে। আর 'রিজার্ভেশন' প্রশ্নে বিচারপতি কৃষ্ণা আয়ারের *ABSK Sang Case* (১৯৮১), থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে:

"A senitized heart and vibrant head tuned to the tears of the people, will speedily quicken the developmental needs of the country than those who are callous to the human lot for the sorrowing masses".

জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের উচিত পেশা ও জন্মের ভিত্তিতে বৈষম্যকে আইন দ্বারা সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা এবং উক্ত আইন লঙ্ঘনের জন্য দেওয়ানি ও ফৌজদারি প্রতিকারের স্পষ্ট বিধান রাখা। দেওয়ানী ক্ষতিপূরণ ও ফৌজদারি দ— কেবলমাত্র সরাসরি আইন অমান্যকারীর উপর সুনির্দিষ্টভাবে প্রয়োগই নয়, তা এর অন্যান্য সহায়তাকারী এবং প্ররোচনাকারীর উপরও প্রযোজ্য হওয়া উচিত যা কর্পোরেশন ও সরকারি কর্মকর্তাণ্ঢকর্মচারিসহ সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৮. 'লালন বলে জাতের কিরূপ দেখলাম না এ নজরে': আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর জন্য সাংবিধানিকভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মানবজাতির প্রগতিশীল আশা আকাঙ্ক্ষার চেতনার কথা বলা আছে সংবিধানের মুখবন্ধে এবং ২৫ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের দায়বদ্ধতা নিজ কাঁধে নিয়েছে। সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ, আইসসিপিআর এবং আইসিইএসসিআর, সিডওসহ বড় বড় মানবাধিকার দলিলে বাংলাদেশ স্বাক্ষরদাতা দেশ। আমরা এখানে বর্ণবৈষম্য রোধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদের নাম বিশেষভাবে নিতে চাই। ওই সনদের মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহকে সবধরনের জাতণ্ঢপাত বৈশিষ্ট্য দূর করার জন্য প্রশাসনিক, বিচারিক ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করার দায় রাষ্ট্রগুলোর উপর আরোপ করা হয়েছে। এখানে বৈষম্যের যে সংজ্ঞা দেয়া আছে তা ব্যাপক ও সম্প্রসারিত। এ প্রসঙ্গে বর্ণ বৈষম্য রোধ সংক্রান্ত কমিটির সদস্য প্যাট্রিক থর্নবেরির (২০০৫) কথাটি বেশ প্রণিধানযোগ্য:

It is an obvious point but easily missed----that the umbrella term for the convention is 'racial discrimination', not race. Thus, racial discrmination is given a stipulative meaning by the convention; as precisely the five terms set out in Article I, which means 'race' but four other terms as well. It is thus clean that the *scope of the convention is broader than...notions of race, which in any case may express many usages.* (Cited in David Keane: 2005)

সুতরাং আমাদের সমাজে প্রচলিত জাতণ্ঢপাত বৈষম্যকে ঐ কনভেনশনের আওতার বাইরে নিয়ে যাবার সুযোগ নেই। সম্প্রতি (২০০৪ণ্ঢ ২০০৯) জাতিসংঘ পেশা ও জন্মের ভিত্তিতে বৈষম্য কার্যকরভাবে দূরীকরণের লক্ষ্যে একটি খসড়া নীতিমালা ও নির্দেশনাবলী প্রণয়ন করেছে। এই নীতিমালা এখনও খসড়া পর্যায়ে থাকলেও, তা জাতিসংঘ সদস্যরাষ্ট্রগুলোর জন্য একটা শক্তিশালী বার্তা। নীতিমালার ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের উচিত পেশা ও জন্মের ভিত্তিতে বৈষম্যকে আইন দ্বারা সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা এবং উক্ত আইন লঙ্ঘনের জন্য দেওয়ানি ও ফৌজদারি প্রতিকারের স্পষ্ট বিধান রাখা। দেওয়ানী ক্ষতিপূরণ ও ফৌজদারি দ— কেবলমাত্র সরাসরি আইন অমান্যকারীর উপর সুনির্দিষ্টভাবে প্রয়োগই নয়, তা এর অন্যান্য সহায়তাকারী এবং প্ররোচনাকারীর উপরও প্রযোজ্য হওয়া উচিত যা কর্পোরেশন ও সরকারি কর্মকর্তাণ্ঢকর্মচারিসহ সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৯. সত্য কাজে কেউ নেই রাজি !

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'সারা বিশ্ব আজ দুইভাগে বিভক্তঃ শাসক আর শোষিত, আমি শোষিতের পক্ষে'। আর একটা কথা তিনি ব্যবহার করতেন 'আমার দুঃখী মানুষ'! হায়! সেই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সেরকম নেতৃত্ব কই! সংবিধানের উচ্ছ্বাস হলো শোষণহীন সমাজ। চলিণ্ঢশ বছরের বটবৃক্ষ বাংলাদেশের মানুষ একটা শোষণতান্ত্রিক ন্যায়পরিচালন ব্যবস্থার স্থায়ী প্রজা বনে গেছে। এই শোষণ ব্যবস্থার আগল ভাঙ্গতে হবে। আইন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিয়ামক। মানব কর্মের অন্যতম দিক। এই কর্মের মাধ্যমে দলিতদের মুক্তি অর্জনের সব বাধাকে দূর করতে হবে। এই বাধাগুলো আসে অজ্ঞতা, দারিদ্র, আঘাত, অসম বণ্টন, অসুখ এবং বিবিধ স্বার্থের দ্বন্দ্বের মিথস্ক্রিয়া থেকে। মুক্তির স্বাদ কী? কী এর মানদ—? আমরা মাপতে পারবো না। শুধু Learned Justice Hand এর সুরে বলতে পারবো, 'একটা চড়ুই পাখিও বিনা কারণে মাটিতে ভূপাতিত হবে না'ণ্ঢ এই হওয়া উচিত মুক্তি ও ন্যায়বিচারের পরশপাথর। এটা অর্জনের জন্য প্রয়োজন আলোকিত রাজনীতি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ। চাই আইনীণ্ঢমনস্তাত্ত্বিকসহ ব্যাপক ধরনের পুর্নজাগরণ। কিন্তু ঘুমাতে যাবার আগে আমাদের পাড়ি দিতে হবে অনেক বন্ধুর পথ। কিছু মানবদরদী রাজনীতিককে দলিতদের ভাগ্য পরিবর্তনে আম্বেদকরীয় আলোকবর্তিকা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

দোহাই :

১। অস্পৃশ্যতা, দারিদ্র ও পুরুষতন্ত্র, বাংলাদেশে দলিত নারীর বিপন্নতা, বিডিএইচআর এবং নাগরিক উদ্যোগ, ২০০৮।

২। ইফতেখার উদ্দিন চোধুরী, দক্ষিণ এশিয়ায় জাতিণ্ঢ বর্ণ বৈষম্য: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, সেন্টার ফর সোশ্যাল রিসার্চ, ২০০৮।

৩। আলতাফ পারভেজ এবং রমেন বিশ্বাস, বৈচিত্র্য ও সামাজিক বঞ্চনা, বংশ ও পেশাগত কারণে বৈষম্যের শিকার জনগোষ্ঠীর অবস্থান নির্ণয়, বিডিইআরএম এবং নাগরিক উদ্যোগ, ২০১০।

৪। Justice VR Krishna Iyer, *Social Justice-Sunset or Dawn,* Estern Bank Company, 1993.

৫। Justice VR Krishna Iyer, *Social Democracy and Dalit Egalite,* 1989.

৬। Justice VR Krishna Iyer, *Dr. Ambedkar and the Dalit Future*, 1990.

৭। David Keane, *Caste based Discrimination in International Human Rights Law,* Ashgate, 2007.

৮। হরিশংকর জলদাস, ivg‡Mvjvg, প্রথমা প্রকাশন, ২০১২।

৯। মূলক রাজ আনন্দ, *Untouchable,* ১৯৩৫।

এস এম মাসুম বিল্লাহ: সহকারী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। কোণ্ঢঅর্ডিনেটর, কমিউনিটি 'ল রিফর্ম প্রকল্প।

কৃতজ্ঞতা: উম্মে ওয়ারা মিশু।

billah002@gmail.com

২০১২ সালে ২ আগস্ট জাতীয় প্রেসক্লাবে বিডিইআরএম ও নাগরিক উদ্যোগ আয়োজিত 'বাংলাদেশে দলিত বিপন্নতা: সামাজিক ন্যায়বিচার ও আইনের স্বরূপ সন্ধান' শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ।

অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ

একজন সফল শিক্ষক-সংগঠকের চিরবিদায়

জাকির হোসেন

মৃত্যুর অনিবার্য আলিঙ্গনে সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন সমাজের শিক্ষক ও সফল সংগঠক অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও নাগরিক জীবনের পথচলায় অভিভাবকত্ব ও নেতৃত্বের যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে তা সহজে পূরণ হবার নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং সুস্থ গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর নিঃসংকোচ অংশগ্রহণ দেশকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন।

খান সারওয়ার মুরশিদের প্রধান পরিচয় তিনি একজন আদর্শবান শিক্ষক। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। তারও আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে অনুপ্রাণিত করেছেন অজস্র গুণী শিক্ষার্থীকে। ইংল্যান্ডের নটিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করেছিলেন। পরে উচ্চতর গবেষণা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরিতে। ছিলেন কমনওয়েলথের সহকারী মহাসচিব। ১৯৮৪ সালে অবসর নেওয়ার পর ২০০৩ সাল পর্যন্ড় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানী অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতা করেছেন।

১৯২৪ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার নাসিরাবাদ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ড় পরিবারে তাঁর জন্ম। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জর্জ হাইস্কুল থেকে ১৯৩৯ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর ফেনী সরকারি কলেজ ও কুমিলণ্ঢার ভিক্টোরিয়া কলেজ পার হয়ে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে। ১৯৪৮ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগেই যোগ দেন প্রভাষক হিসেবে। প্রভাষক হিসেবে যোগ দেওয়ার পরের বছর অধ্যাপক মুরশিদ নিজের সম্পাদনায় প্রকাশ করেন ইংরেজি সাময়িকপত্র 'নিউ ভ্যালুজ'। তাঁর সংগঠক মননের পরিচয় মিলে গত শতকের ষাটের দশকেই। ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠাতাণ্ঢসভাপতি হিসেবে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী 'সংস্কৃতি সংসদ'ণ্ঢএর সূচনা করেন।

পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার তিনি সম্পাদক ছিলেন। ৫২'র ভাষা আন্দোলনেও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রণ্ঢজন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ড় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করার সময় তাঁর নেতৃত্বেই শুরু হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের প্রস্তাবনা ও অবকাঠামো তৈরির প্রক্রিয়া। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা আন্দোলনের অন্যতম নীতিনির্ধারক ও পরিকল্পনাকারী। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্য হিসেবে তাঁর ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। মুক্তিযুদ্ধণ্ঢউত্তর বাংলাদেশে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আইবিএস)।

তাঁর স্মরণে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান লিখেছেন, 'ব্যক্তি খান সারওয়ার মুরশিদের জীবন ছিল বৈচিত্রময় কর্মের এক বিশাল সম্ভার। দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। অন্যদিকে তিনি ছিলেন সমাজসচেতন। ফলে নিজ কর্মের পাশাপাশি এদেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি ওঁর সহমর্মিতা ছিল। অনেক ক্ষেত্রে তিনি এসব আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন'। নাগরিক সমাজের পক্ষে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য শহীদ জননী জাহানারা ইমাম যে গণতদন্ত কমিশন গঠন করেছিলেন, অধ্যাপক সারওয়ার মুরশিদ ছিলেন সেটির অন্যতম সদস্য। পরবর্তীতে দেশের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর হাতেই গড়ে ওঠে মানবাধিকারভিত্তিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'নাগরিক উদ্যোগ'। ব্যক্তিগতভাবে খুব কাছ থেকে আমি তাঁকে দেখেছি, আচারণ্ঢব্বহারে মানুষের মাঝে মুগ্ধতা ছড়ানোর অনন্য এক গুণ ছিল তাঁর মধ্যে। তাঁর সরাসরি ছাত্র না হয়েও তাঁর কাছ থেকে শিখেছি অনেক, এটা আমার সৌভাগ্য।

অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ আজ আমাদের মাঝে নেই। তাঁর মৃত্যু মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্য অনেক বড় এক শূন্যতা। তাঁর জ্ঞান, চিন্তা ও নির্দেশনার আলোকে এগিয়ে যেতে পারলেই কেবল তাঁর প্রতি আমাদের এই ঋণ শোধ হবে। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনিই আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস।

অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদের স্বহস্তে লিখিত চিঠি

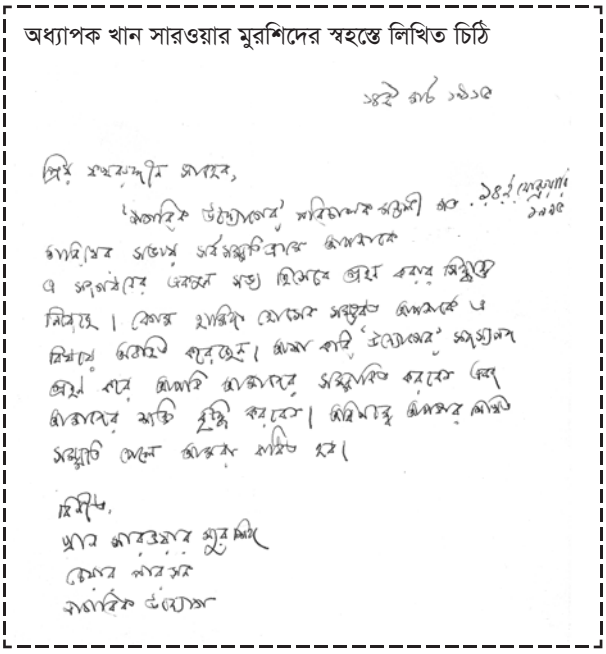

২৪ই মার্চ ১৯৯৫

প্রিয় মহাশয়,

'নাগরিক উদ্যোগের' পরিচালক কমিটি গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ মাসিক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আপনাকে এ সংগঠনের একজন সভ্য হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্র পরিচালক মোতাবেক সম্মতিক্রমে আপনাকে এ লিখছে অবহিত করেছেন। আমার কাছে 'উদ্যোগের' সদস্যপদ গ্রহণ করে আপনাকে সম্মানিত করবে এবং আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবে। নিয়মিত আপনার লিখিত সম্মতি পেলে আমরা খুশি হব।

বিনীত,
খান সারওয়ার মুরশিদ
চেয়ারপারসন
নাগরিক উদ্যোগ

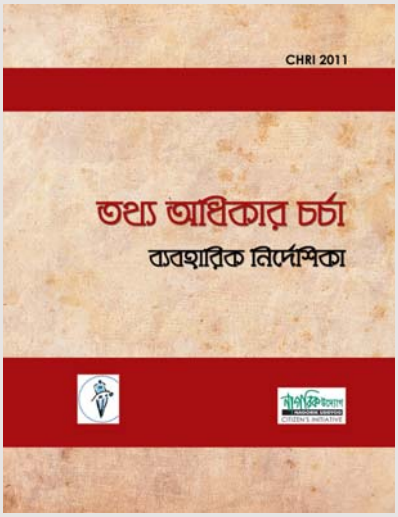

তথ্য অধিকার চর্চা : ব্যবহারিক নির্দেশিকা

এ বইটিতে তথ্য অধিকার আইনের প্রধান ধারাসমূহ, তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার, তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা, তথ্য কমিশনসহ তথ্য অধিকার আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে কী ধরনের তথ্য পাওয়া যাবে, কী কী তথ্য সরকার দিতে বাধ্য নয় এবং তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের ইতিবাচক উদাহরণসহ বিভিন্ন বিষয় কেইসস্টাডির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে যা সকল স্তরের জনগণকে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করবে। বইটির উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির মৌলিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ তথ্যের জন্য অনুরোধ, আপিল ও অভিযোগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে নমুনাসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। আশা করছি, এ পুস্তকটি তথ্য প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ সকল নাগরিকের তথ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্যে করবে।

গ্রন্থনা, বিশ্লেষণ ও সম্পাদনা : মাজহারুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম ও অমিত রঞ্জন দে

প্রকাশক : নাগরিক উদ্যোগ ও কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ

প্রকাশকাল : ২০১১

মূল্য : ২০০ টাকা

ISBN : 978-984-33-3305-6

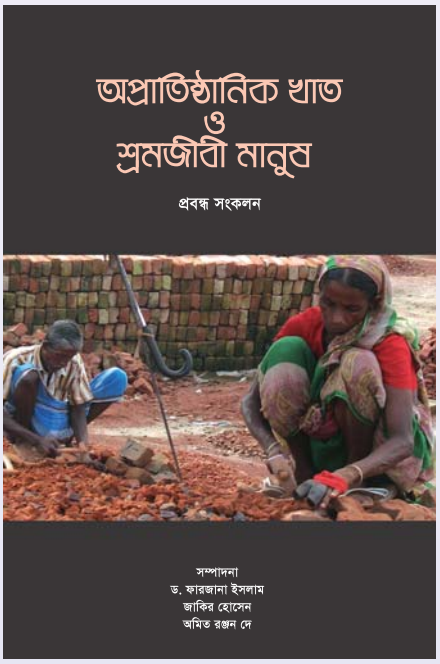

পার্টনারশিপ অব উইমেন ইন একশন (পাওয়া) এবং নাগরিক উদ্যোগ যৌথভাবে গত অক্টোবর মাসের শুরুতে 'অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবীদের জাতীয় সম্মেলন ২০০৯' আয়োজন করে। দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলনে ৩০টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। সংকলনটিতে প্রকাশিত বিভিন্ন নিবন্ধে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবীদের সামাজিক স্বীকৃতি, মতাদর্শের বিকাশ, শ্রমক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তন এবং তাদের জীবনমানের সার্বিক গুণগত উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করা হয়েছে। বইটি যৌথভাবে প্রকাশ করেছে পার্টনারশিপ অব উইমেন ইন একশন (পাওয়া) এবং নাগরিক উদ্যোগ।

সম্পাদনা : ড. ফারজানা ইসলাম, জাকির হেসেন ও অমিত রঞ্জন দে

প্রকাশক : পার্টনারশিপ অব উইমেন ইন একশন (পাওয়া) এবং নাগরিক উদ্যোগ

প্রকাশকাল: জুন ২০১০

মূল্য: ২০০ টাকা

ISBN : 978-984-33-1623-3